আমরা সেই সে জাতি

আবুল আসাদ

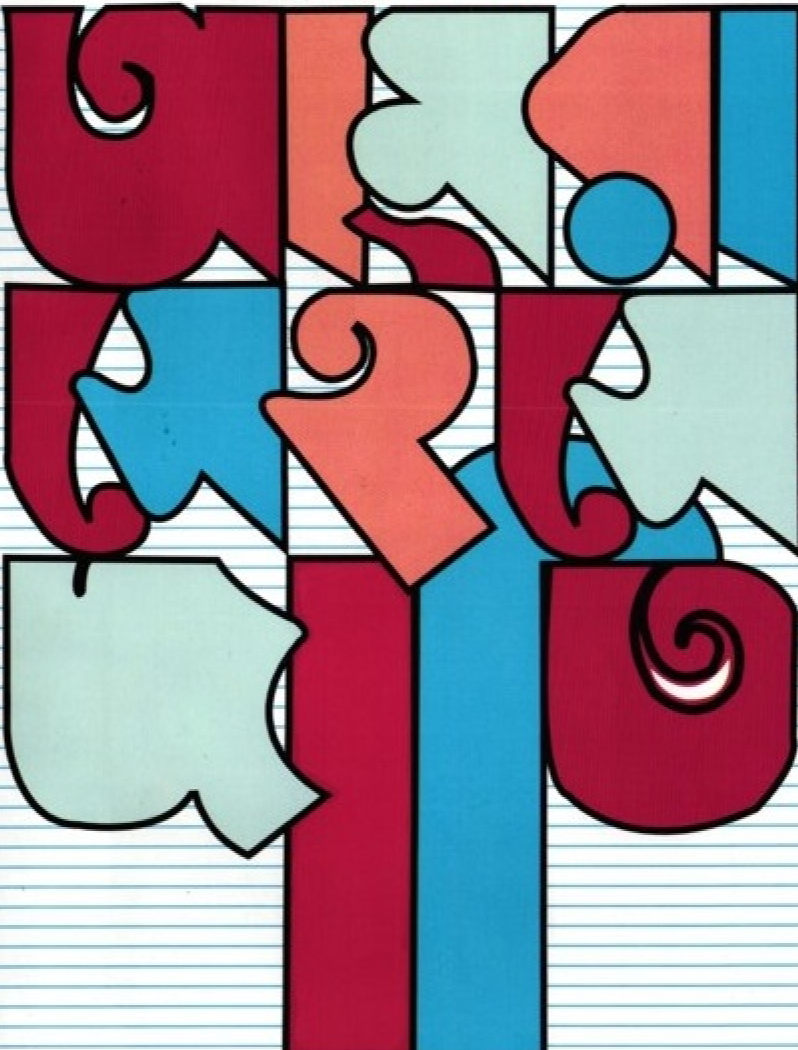

তিন

আমরা সেই সে জাতি

[তৃতীয় খণ্ড]

আবুল আসাদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-31-0932-5 set

প্রথম প্রকাশ ঃ অগাস্ট ২০০৩
পঞ্চম প্রকাশ ঃ শাবান ১৪৩৩
শ্রাবণ ১৪১৯
জুলাই-২০১২

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

বিনিময় ঃ ষাট টাকা মাত্র

Amra Shei She Jati Vol-III Written by Abul Asad and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition August 2003 5th Edition July 2012 Price Taka 60.00 only.

সূচীপত্র

ইবনে জাহাশের কাফেলা ৭

জান্নাতের সুগন্ধ ৮

অজেয় যে বাহিনী ৯

সোনার টুকরোরা ১১

যে নিরাপত্তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় ১২

ওহোদ গিরিপথের দৃষ্টান্ত ১৩

দেহ যাদের ঢাল হল ১৪

সহস্র জীবন দিয়েও চাই যে মরণ ১৬

বে-নজীর অগ্নি-পরীক্ষা ১৭

তিমির অন্ধকারে সূর্যোদয়ের কোরাস ১৯

বিপদের বেষ্টনিতে বিশ্বাসের সঞ্জীবনী ২০

'সে আমর, আমিও আলী' ২২

খালিদের দুর্ধর্ষ বাহিনীও অবসন্ন ২৪

যেমন ছেলে তেমনি মা ২৫

যে যুদ্ধ অস্ত্রের নয় ধৈর্যের ২৬

'... শুকনো রুটি সম্বল করে' ২৮

সীমাহীন বৈরিতার সীমিত শাস্তি ৩০

বিষের পরাজয় বিশ্বাসের জয় ৩১

মদীনার পথে ত্রি-রত্ন ৩৩

নববী এক মোজেজা ৩৪

প্রথম দিগ্বিজয়ী বাহিনীর প্রতি মহানবী ৩৬

সিরিয়ার আকাশে প্রথম 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি ৩৮

খালিদ হলেন সেনাপতি ৪০

যে যুদ্ধে ৮টি তরবারী ভাঙে সেনাপতির ৪১

স্বজনের চেয়ে ওয়াদা বড় ৪৩

'ফাতহুম মুবিনে'র প্রথম বন্দী ৪৫

সেনাপতি সা'আদ পদচ্যুত হলেন ৪৬

মহানবীর চিঠি পড়ে কেঁদে ফেললেন মানজার ৪৮
মহানবী আবারও অভয় দিলেন ৫০
একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদের প্রাণের মালিক ৫২
বিশ্বজয়ী মানবতা ৫৪
'ফাতহুম্ মুবিন' ৫৫
কত মূল্য মানুষের! ৫৭
মহানবীর কণ্ঠস্বরে কেঁপে উঠলেন উসামা ৫৯
'আনান্নাবী লা কাজেব' ৬১
বন্দী মুক্তির এমন দৃশ্য দুনিয়া আর দেখেনি ৬৪
'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনাকে চাই' ৬৬
'এমন শত্রু তো শত্রু নয়' ৬৭
যার কাছে সম্পদ অপেক্ষা সত্য বড় ৬৯
'আমি শহীদদের সাথে মিলিত হতে চললাম' ৭১
ভয়ংকর ছোমামা মহানবীর অতিথি হলো ৭৩
ব্যবসা করতে গিয়ে হলেন মিশনারী ৭৪
বিশ্বের প্রথম 'আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র' ৭৬
আল্লাহর নিয়ামত (ইসলাম) যখন সম্পূর্ণ হলো ৭৮
মহানবীর চির বিদায়ের প্রস্তুতি ৮০
মহানবীর এক গল্পে আবু বকর (রা) কাঁদলেন ৮২
'এই শেষ ভ্রাতৃবর্গ, এই শেষ' ৮৩
বেদনা-বিধুর সেই সোমবার ৮৪
নতুন ইকরামা ৮৬
ইকরামার ওয়াদা পালন ৮৮
'আজ আল্লাহর জন্যে জীবন বিলিয়ে দেবোনা?' ৮৯
শাহাদাতের বাইয়াত ৯০
একটি বক্তৃতা ও কাব্য প্রতিযোগিতা ৯১
হযরত উমর (রা)-এর কঠোর সিদ্ধান্ত ৯৩
উপযুক্ত খাজনা আদায়কারী ৯৪
কবিতার বিনিময়ে আল কুরআন ৯৫
আকাবার প্রথম বাইয়াত ৯৬

আল কুরআনের যাদু-স্পর্শ ৯৮
দুনিয়াটা আপনাদের মত বুজুর্গের কারণে টিকে আছে ১০১
উবাদার (রা) সত্যনিষ্ঠা ১০২
হাদীসের প্রতি ভালোবাসা ১০৩
তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখা ১০৫
মুনাফিক সর্দারের ঈমানদার পুত্র ১০৬
জীবন দিয়ে আদব রক্ষা ১০৭
খাদেমের সাথে ব্যবহার ১০৮
যে খাদ্য বরকতপূর্ণ ১০৯
বারা ইবনে মালিক কথা রাখলেন ১১০
ফিরিশতার সাহায্য ১১১
আল্লাহর রাহে খরচের আকাঙ্ক্ষা ১১২
মাগের ইবনে মালিকের তাওবা ১১৩
উমর (রা) নিজের অহংকারকে শাস্তি দিলেন ১১৫
'আপনি আচরি ধর্ম' ১১৬
ইমাম ইউনুসের ব্যবসায় ১১৭
বিলাল (রা)-এর ঘটকালি ১১৮
আবু বকর উমরকে চাইলেন উসামার কাছে ১১৯
উমর (রা) মনিব ও চাকরকে একসাথে খাওয়ালেন ১২০
উমর (রা) লোকদের সামনে সা'দকে দোররা কষলেন ১২১
ইবনে আবজা যে কারণে গভর্নর হলেন ১২২
খলিফা আল-মানসুর যখন লা-জবাব ১২৩
আবু ইউসুফের বিচার ১২৪
জালেম শাসকের সামনে নির্ভীক আলেম ১২৫
'এ দরবারে শুধু একজন আলেমই আছেন' ১২৬
উমর (রা) জমির মালিক হওয়ার পর ১২৭
হুসাইন ঝর্ণা বিক্রি করলেন ১২৮

ইবনে জাহাশের কাফেলা

মহানবীর (সা) শিশু রাষ্ট্র মদীনা তখন উত্তাল সাগর ঘেরা এক দ্বীপের মত। মক্কা থেকে হিজরত করার পর তখন এক বছর গত হয়েছে। ক'দিন আগে মক্কা থেকে প্রেরিত কাফের কুরাইশদের একটা বাহিনী কুর্জ ইবনে জাবেরের নেতৃত্বে গোপনে এসে অতর্কিতে মদীনার এক প্রান্তরে চড়াও হয়ে মুসলমানদের একটা পশুপাল ধরে নিয়ে গেল।

এমন ধরনের আরও আক্রমণের আশংকা মদীনার মুসলিমদের চিন্তিত করে তুলল। খবর এল, বড় একটা আয়োজন করেছে মক্কার কাফেররা। মদীনায় তারা বড় কিছু ঘটাতে চায়।

একটা কাফেলা সাজালেন মহানবী (সা)। কাফেলার যাত্রী ৮ জন মুসলমান চারটি উটে। কাফেলার অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ।

কাফেলা কোথায় যাবে, কি করবে কেউ জানে না। কাফেলার অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশও নয়।

যাত্রার মুহূর্তে মহানবী (সা) একটি চিঠি আবদুল্লাহর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, মক্কার পথে দু'দিন এগুবার পর এই চিঠি খুলবে। চিঠির নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে। তবে কাউকে তা করতে বাধ্য করবে না।

দু'দিন চলার পর চিঠি খুলল আবদুল্লাহ। দেখল চিঠিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে অবস্থান করে গোপনে মক্কার কাফেরদের গতিবিধির উপর নিয়মিত খবর পাঠাতে হবে মদীনায়।

অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ। বন্দী ও মৃত্যু অবধারিত, এমন এক বিপজ্জনক শত্রু-পুরীতে বসে তাদের কাজ করতে হবে।

বিষয়টি কাফেলার সবাইকে জানিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ঘোষণা করলেন, ভাইসব, কোন জোর নেই, কোন জবরদস্তি নেই। যার ইচ্ছা হয় দেশে ফিরে যান। আর ইসলামের জন্য, আল্লাহর জন্য শহীদের গৌরবজনক মৃত্যু যাদের অভিপ্রেত, তারা আমার সাথে আসুন।

বলে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ কারো দিকে না তাকিয়ে নবীর (সা) আদেশ পালনের জন্য নাখলার দিকে পা বাড়ালেন।

দেখা গেল, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের পেছনে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলল অবশিষ্ট সাতজন।

কারো দৃষ্টিই ফেলে আসা পেছনের দিকে নয়। শহীদি মৃত্যুর হাতছানিতে তারা যেন ভুলে গেছে পেছনের সব।

আনাস ইবনে নযর বদর যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। মুসলমানদের প্রথম অগ্নি-পরীক্ষায় শরীক হতে না পারায় ভীষণ দুঃখ তাঁর। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি একদিন মহানবী (সা)-কে বললেন, আল্লাহ্ যদি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন সুযোগ আমাকে দেন, তাহলে দেখবেন কিভাবে যুদ্ধ করি।

সুযোগ এলো আনাস ইবনে নযরের জীবনে।

ওহোদ যুদ্ধের দিন।

প্রচণ্ড যুদ্ধ।

এক মহাসন্ধিক্ষণে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

তলোয়ার হাতে আনাস ইবনে নযর শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে বললেন মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে, এদের (সাহাবাদের) কৃতকর্মের জন্যে আমি আপনার কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করছি, আর ওদের (কাফেরদের) কাজের সাথে আমার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি।

তারপর ছুটলেন আনাস ইবনে নযর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। পথে দেখা হলো সা'আদ ইবনে মু'য়াযের সাথে। বললেন আনাস সা'আদকে, 'এ মুহূর্তে জান্নাতই আমার একমাত্র কাম্য, ওহোদের প্রান্তভাগ থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি।'

যুদ্ধের পরে আনাস ইবনে নযরকে শহীদ অবস্থায় পাওয়া গেল যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁর দেহে তলোয়ার, বর্শা ও তীরের আশিটিরও অধিক জখম। মুশরিকরা নাক, কান কেটে ও চোখ উপড়িয়ে তাঁর লাশকে এতোটাই বিকৃত করেছিল যে বোন ছাড়া আর কেউ তাকে চিনতে পারেনি।

ধারণা করা হয়, কুরআন শরীফের এই আয়াত "মুমিনদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক আল্লাহর কাছে কৃত তাদের ওয়াদা বাস্তবে রূপ দিয়ে দেখিয়েছেন"– আনাসের শাহাদাত উপলক্ষেই নাযিল হয়।

বদর যুদ্ধের প্রারম্ভ।

যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি।

মক্কার কুরাইশদের মুশরিক (কাফের) বাহিনী এবং মহানবী (সা)-এর নেতৃত্বে মদীনার মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি দণ্ডায়মান।

কুরাইশদের সহস্রাধিক সৈন্য বিপুল যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত। কুরাইশ বাহিনীর শুধু সামনের কাতারেই আপাদমস্তক লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত শতাধিক ঘোড়সওয়ার দেখা যাচ্ছে।

মহানবীর (সা) বাহিনীতে একটি মাত্র ঘোড়া। তলোয়ার ও তীর ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই তাদের।

যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে।

চারদিকে শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনা।

মহানবী (সা) মুসলিম বাহিনীর প্রতিটি ব্যূহ, প্রতিটি ছত্র পরিদর্শন শেষে সবার সামনে এসে দাঁড়ালেন। সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আদেশ করলেন, সকলে সাবধান! তোমরা আগে আক্রমণ করবে না। বিপক্ষরা আক্রমণ করলে তীর নিক্ষেপ করে বাধা দেবে। সাবধান! আমি আদেশ না দেয়া পর্যন্ত আক্রমণ করবে না।

তারপর মহানবী (সা) প্রবেশ করলেন তাঁর জন্যে তৈরী কাপড়-ঘেরা বিশ্রাম স্থানে।

এ সময় কুরাইশ সৈন্যের পক্ষ থেকে তীর বর্ষণ শুরু হলো। একটি তীর এসে মুসলিম বাহিনীর মেহজা নামক সাহাবীর বক্ষ বিদীর্ণ করল। ঢলে পড়ল তার রক্তাক্ত দেহ মাটিতে। শাহাদাৎ বরণ করলেন তিনি।

মুসলিম সৈন্যের সকলের তীর তখনও তুনিরে আবদ্ধ। আক্রমণের হুকুম নেই মহানবীর। নীরবে তারা সকলে দেখল সাথীর মৃত্যু।

মহানবী (সা)-এর আরেকজন সাহাবী হারেছা ইবনে সুরাকা পানি পান করতে যাচ্ছিলেন। বিপক্ষের একটা তীর তাঁর কণ্ঠনালি বিদ্ধ করল। তিনিও শাহাদাৎ বরণ করলেন।

কিন্তু মুসলিম বাহিনী পাথরের মত স্থির, নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। শান্ত, অচঞ্চল চোখে তারা দেখলো আরেক সাথীর মৃত্যু। মহানবীর আদেশ নেই তাই একটা তীরও তুনির থেকে বেরুলো না, একটা তরবারিও কোষমুক্ত হলো না। কারও চোখে প্রতিশোধের একটা স্ফুলিঙ্গও জ্বলল না।

কুরাইশ বাহিনীর ওমের ইবনে আহর ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিল ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর অবস্থা, সংখ্যা, রণসজ্জা দেখার জন্যে। মুসলিম বাহিনীর চারদিক ঘুরে দেখার পর ফিরে গিয়ে সে বলল, মুসলমানদের সংখ্যা তিনশ'র বেশী হবে না। ওদের পেছনে সাহায্যকারী কেউ নেই এবং আত্মরক্ষার জন্যে তরবারি ছাড়া কোন অস্ত্র নেই তাদের। কিন্তু তাদের দেখে মনে হলো, একটি প্রাণের বিনিময় না দিয়ে তাদের একটি প্রাণনাশ করতে আমরা পারবো না। এমন বাহিনীকে জয় করা কঠিন।

ওহোদ যুদ্ধের প্রাক্কাল।

মহানবীর মদীনা ধ্বংসের জন্যে কালবৈশাখীর মত ধেয়ে আসা কুরাইশ বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে উপস্থিত।

মহানবীর নেতৃত্বে মুসলমানরা যুদ্ধযাত্রা করেছে।

ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী। কুরাইশদের তিন হাজারের মুকাবিলায় মাত্র সাতশ' জন।

ছোট কিশোরদের বাহিনীতে নেয়া হয়নি।

কিন্তু কয়েকজন নাছোড়বান্দা।

তবু তাদের অনুরোধ ফিরিয়ে দিলেন মহানবী (সা)।

তাদের একজন রাফে নিজেকে বড় করে তোলার জন্যে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ভর করে উঁচু হয়ে নিজের বড়ত্বকে প্রমাণ করতে চাইল।

সবাই বললো, রাফে একজন উৎকৃষ্ট তীরন্দাজ। সকলের অনুরোধে মহানবী (সা) তাকে বাহিনীতে শামিল করলেন।

এটা দেখে আরেক বালক সামরা ইবনে জোন্দা ছুটে এলো মহানবীর কাছে। অভিমানী কণ্ঠে বললো, 'কুস্তিতে রাফেকে আমি হারিয়ে দিয়ে থাকি। সে যুদ্ধের অনুমতি পেলো, আর আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে!'

বালকের এই অভিমানে আনন্দ পেলেন মহানবী (সা)। হাসিমুখে আদর করে বললেন, লড়ো দেখি কুস্তি রাফের সাথে।

সত্যই মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো দুই বালকের মধ্যে।

জিতে গেলো অভিমানী সামরা।

মহানবী (সা) হেসে বললেন সামরাকে, বেশ তোমাকেও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো।

এই সোনার টুকরোরাই, ঈমানের এই জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গরাই পরবর্তীকালে অর্ধেক পৃথিবীর উপর ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিল।

যে নিরাপত্তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়

বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা।

মক্কায় কুরাইশরা বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পাগল হয়েছে তখন।

রাত-দিন তারা ব্যস্ত শলাপরামর্শ আর আয়োজনের তৎপরতায়। মহানবী (সা) কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খোঁজ-খবর নেবার জন্যে একটা অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করলেন।

দশজনের সে দলটির নেতৃত্ব দিলেন আসেম ইবনে সাবিত।

অনুসন্ধানী এ দলটি মক্কা ও উসফানের মধ্যবর্তী হাদয়াহ্ পর্যন্ত পৌঁছলে তা টের পেয়ে গেল হোযায়েল গোত্রের বনু লেহিয়ান শাখা।

খবর পাওয়ার সাথে সাথেই ওরা দু'শ' তীরন্দাজের একটা বাহিনী প্রেরণ করল নবী (সা) প্রেরিত অনুসন্ধানী দলকে ধরার জন্যে।

ক্ষুদ্র দলটি ওরা ঘিরে ফেলল।

আসেম ইবনে সাবিতের নেতৃত্বাধীন ১০ জনের ক্ষুদ্র বাহিনীটি ঘেরাও হয়ে পড়ার পর একটা পাহাড়-শীর্ষে উঠে দাঁড়াল।

শত্রুবাহিনী পাহাড়টির চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে বলল, তোমাদের একজনকেও হত্যা করব না।

দলনেতা আসেম ইবনে সাবিত পাহাড়-শীর্ষ থেকে বললেন, আল্লাহর শপথ, কাফেরের প্রদত্ত নিরাপত্তায় আমরা পাহাড় থেকে নামব না।

চারদিক থেকে বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ শুরু হলো। একে একে ওরা ঢলে পড়তে লাগল মৃত্যুর কোলে। তীরে তীরে ক্ষত-বিক্ষত আসেম ইবনে সাবিতেরও সময় ঘনিয়ে এল। প্রার্থনার জন্যে হাত তুললেন তিনি। বললেন, "হে আল্লাহ, আমাদের অবস্থার খবর আপনার নবীকে জানিয়ে দিন।"

ওহোদ যুদ্ধের এক মহা সন্ধিক্ষণ। মুসলিম বাহিনীর জয় বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে। মুসলিম বাহিনীর পেছনে ওহোদ পাহাড়ের এক গলিপথে মহানবী (সা) ৫০ জনের একটি ক্ষুদ্র দলকে পাহারায় রেখেছিলেন। তাদের উপর নির্দেশ ছিল, তাদের শরীরের গোস্ত পাখিরা ঠুকরে যদিও খায় এবং রণাঙ্গনের মুসলিম সৈন্য সবাই যদি মরেও যায় তবু তারা যেন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত গলিপথ ত্যাগ না করে। সুদক্ষ সেনাপতি মহানবী (সা) নিশ্চিতই বুঝেছিলেন যে, মুসলিম বাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণের জন্য মক্কার মুশরিক বাহিনী অবশ্যই কিছু লোক এ গলিপথের পেছনে রাখবে।

যুদ্ধ জয়ের আনন্দে পাহাড়ের এই গলিপথে মোতায়েন সৈন্যদের অধিকাংশ গলিপথ ত্যাগ করে শত্রুমুক্ত রণক্ষেত্রের দিকে ছুটতে শুরু করেছিল।

মোতায়েন এই ক্ষুদ্র দলের সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের প্রাণপণ চেষ্টা করলেন মহানবীর (সা) আদেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওদের নিবৃত্ত করতে। 'আমাদের সম্পূর্ণ জয় হয়েছে, এখন এখানে আর বসে থাকব কেন'– এই যুক্তি তুলে তারা দলনেতা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নিষেধ উপেক্ষা করল।

কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের কয়েকজন সাথী নিয়ে মহানবী (সা) নির্দেশিত স্থান থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণও নড়লেন না।

পাহাড়ের সেই গলিপথে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে পাহাড়ের পেছনে ওত পেতে থাকা মুশরিক সৈন্যের দু'শ' অশ্বারোহীর একটা বাহিনী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং তাঁর কয়েকজন সাথীর উপর। তাঁরা কয়েকজন প্রথমে তীর ছুড়ে, তারপর তলোয়ার দিয়ে শত্রুদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো। তাদের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে এক এক করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অক্ষত থাকা অবস্থায় একজন শত্রু সৈন্যকেও তাদেরকে অতিক্রম করতে দেয়নি।

ওহোদ যুদ্ধের মর্মন্তুদ ও মহোত্তম দৃশ্য।

যুদ্ধে বিপর্যয় ঘটেছে। বিপর্যয়ের মধ্যে বিপর্যয়। খবর রটল যে, মহানবী (সা) নিহত হয়েছেন।

মুসলিম বাহিনীর পতাকাধারী মুছআব নিহত হওয়ার থেকেই এই খবর রটে। রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারার সাথে তাঁর চেহারার বাহ্যিক কিছুটা সাদৃশ্য দর্শনে মক্কার মুশরিক ইবনে কামিয়া এই খবর রটিয়ে দেয়।

মুহূর্তেই খবরটি যুদ্ধক্ষেত্রে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল। বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে এই খবরটি যাচাই করা অধিকাংশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে এই খবর মক্কার মুশরিক সৈন্যদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও নতুন শক্তির সঞ্চার করলো। বিপর্যয়ের মধ্যে মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংসের জন্যে তারা বন্যার তীব্র স্রোতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্যদিকে বিপর্যয় ও মহা দুঃসংবাদ একসাথে হয়ে অনেক মুসলিম সৈন্যের সব শক্তি ও সাহস কেড়ে নিল। তারা হতাশ হয়ে পড়ল যে, মহানবী (সা) না থাকলে কি হবে এই যুদ্ধ দিয়ে।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে মক্কার মুশরিক সৈন্যরা যখন জানতে পারল যে, মহানবী (সা) জীবিত আছেন, তখন তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালেন মহানবী (সা)।

মুসলিম বাহিনীর বিশৃঙ্খল ও বিপর্যয়কর অবস্থায় পরিস্থিতিটা অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াল।

যুদ্ধক্ষেত্রের একটি স্থানে সাহাবীদের একটি ক্ষুদ্র দল তাদের দেহ দিয়ে মহানবীকে আড়াল করে চারদিক থেকে বন্যাবেগের মত ছুটে আসা মুশরিক সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করছিল। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে এক এক করে তারা ঢলে পড়ল। অবশিষ্ট থাকলো মাত্র তালহা এবং সা'আদ।

দু'জনেই মদীনার অব্যর্থ-লক্ষ্য তীরন্দাজ। তাঁরা ঘুরে ঘুরে তাঁদের দেহ দিয়ে মহানবীর দেহকে আড়াল করে অবিরাম তীর ছুড়ে কাফেরদের হত্যা করছিল ও তাদের ঠেকিয়ে রাখছিল। সা'আদ একাই সেদিন দু'খানা ধনুক ভেঙেছিলেন এবং সহস্রাধিক তীর ছুড়েছিলেন। এক কঠিন মুহূর্তে তালহা তীর ধনুক বাদ দিয়ে

নিজের ঢাল ও নিজের দেহ দিয়ে মহানবীকে আচ্ছাদন করতে লাগলেন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ল তাঁর দেহ। এ সময় দূর থেকে আবু দোজানা ছুটে এলেন এ দৃশ্য দেখে। যোগ দিলেন তিনি তালহা ও সা'আদের সাথে। দেখলেন আবু দোজানা শত্রুর একটা বর্শা ছুটে আসছে মহানবীকে লক্ষ্য করে। আবু দোজানা বুক দিয়ে মহানবীকে আচ্ছাদন করে পৃষ্ঠদেশ এগিয়ে দিলেন বর্শার দিকে। বর্শা তার পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করল।

উম্মে আমারা আহত মুসলিম সৈন্যদের পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন মহানবী (সা)-এর আক্রান্ত হওয়ার কথা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পানির মশক ফেলে দিয়ে ছুটলেন মহানবীর কাছে। যোগ দিলেন মহানবীর কয়েকজন সাথীর দলে। প্রথমে অবিরাম তীর বর্ষণ। তীরে যখন কুলালো না, তখন তিনি তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুর উপর। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে তাঁর দেহ, কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। এ সময়ের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা) বলেছেন, "সেই বিপদের সময় দক্ষিণে, বামে যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি উম্মে আমারা আমাকে রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করছে।"

সোনার মানুষেরা যখন তাঁকে ঘিরে এভাবে লড়াই করছেন, তখন এই সোনার মানুষগুলো যাঁর হাতে গড়া সেই মহানবী (সা) অচঞ্চল পর্বতের মত দণ্ডায়মান। ভয় নেই, ভীতি নেই, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নেই, শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অবসাদ নেই, বিষণ্নতা নেই। পর্বতের মত দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র বাহিনীকে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন, পরিচালনা করছেন।

এক শত্রুর আঘাতে তার লৌহ শিরস্ত্রাণের দুই কড়া যখন তার মাথায় ঢুকে গেল, রক্তের দরবিগলিত ধারায় তাঁর মুখমণ্ডল ও দেহ যখন রঞ্জিত হচ্ছিল তখন তিনি প্রার্থনা করলেন, "হে আমার প্রভু, আমার জাতিকে তুমি ক্ষমা কর। কারণ তারা অজ্ঞ।"

সেদিন মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় পরাজয় পর্যন্ত পৌঁছেনি অকুতোভয় ঐ সব সোনার মানুষদের কারণেই। মুসলিম বাহিনী হামজা, মুছআব প্রমুখের মত ৭০ জনের জীবন বিসর্জনের বিনিময়ে বিপর্যয় রোধ করেছিল। ৩ হাজার সৈন্যের বিশাল মুশরিক বাহিনীকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল মক্কায়।

ওহোদ যুদ্ধ। মুসলমানদের জয় বিপর্যয়ে পরিণত হবার পরের মুহূর্ত। মহানবী (সা) তখন যুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন। পেছন থেকে শত্রুর আকস্মিক আক্রমণে বিজয়-আনন্দরত মুসলিম সৈন্যরা একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে পারল না। বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে তারা।

মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যের ছোট্ট একটি দল মহানবী (সা)-কে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে। মক্কার মুশরিক সৈন্যরা একে মহা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল। মহা আস্ফালনে চারদিক কাঁপিয়ে মুশরিক সৈন্যরা ঝড়ের বেগে অগ্রসর হলো মহানবী (সা)-কে লক্ষ্য করে। এই ঝড় প্রতিহত করতে হলে এর চেয়েও দুরন্ত গতির আরেক ঝড় প্রয়োজন। মহানবী (সা) তাকালেন তাঁর চারদিকের সাথীদের দিকে। ধ্বনিত হলো তার তেজদীপ্ত গম্ভীর কণ্ঠ, 'নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে শত্রুর গতিরোধ করতে পারে, এমন কে আছে?' মহানবীর (সা) ঠোঁটের শেষ শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই আনসার যুবক জিয়াদ তেজদীপ্ত কণ্ঠে হুংকার দিয়ে বলে উঠল, 'আমি আমি।'

কণ্ঠে তার সেকি তেজ! দু'চোখে তার ভক্তির কি অপূর্ব বিচ্ছুরণ!

মহানবীর (সা) আদেশ নিয়েই জিয়াদ পাঁচ-সাতজন আনসার যুবককে সাথে নিয়ে ভীষণ গতির এক ঝড় তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উপর।

এ যেন বেগ-এর উপর এক মহাবেগ-এর আঘাত। শত্রুর গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। চলল মরণপণ ক্ষুদ্র একটি দলের সাথে আক্রমণকারী বাহিনীর লড়াই। পেছনে হটে গেল মুশরিক বাহিনী অনেক ক্ষতি স্বীকার করে। শত্রু সরে গেলে দেখা গেল, জিয়াদ-এর ক্ষুদ্র বাহিনীর কেউ দাঁড়িয়ে নেই। শহীদ হয়েছেন বেশিরভাগ। জিয়াদ তখন মুমূর্ষু। মহানবী (সা) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জিয়াদকে তুলে আনার নির্দেশ দিলেন।

মুমূর্ষু জিয়াদের মাথা মহানবী (সা) নিজের পদযুগলের উপর রাখলেন। প্রার্থনা করতে লাগলেন জিয়াদের জন্যে। জিয়াদের প্রাণটা যেন এ মহাসৌভাগ্যেরই অপেক্ষা করছিল।

মুমূর্ষু জিয়াদের মুখটি গড়িয়ে গিয়ে তার গণ্ড মহানবী (সা)-এর পদযুগল স্পর্শ করল। পর মুহূর্তেই তার প্রাণপাখি উড়ে গেল। উড়ে গেল যেন জান্নাতের উদ্দেশ্যে।

কবির ভাষায় একি মরণ! সহস্র জীবন উৎসর্গ করেও এমন জীবনের সাক্ষাত পাওয়া যায় না।

ওহোদ যুদ্ধের দিবাগত রাত।

রাত তখন গভীর।

বনি খোজায়া গোত্রের প্রধান মা'বাদ এলেন মদীনায়। বনি খোজায়া মুসলমানদের মিত্র গোত্র। ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের অসুবিধার খবর পেয়ে মুসলমানদের সমবেদনা জানাবার জন্যে রাতেই মা'বাদ মদীনা যাত্রা করেছিলেন। আসার পথে হামরাউল আসাদ স্থানে এসে দেখলেন, মক্কার আবু সুফিয়ানের বাহিনী মক্কার পথ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার মদীনা আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হচ্ছে। শুনলেন তিনি, মুসলমানদের অনেকে নিহত, আহত অধিকাংশ সাহাবী রাসূলুল্লাহ্সহ। এই সুযোগে মদীনার মুসলমানদের ধ্বংস না করে ফিরে গেলে এই সুবর্ণ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। এই চিন্তা করেই তারা মদীনা ধ্বংসের জন্যে অগ্রসর হচ্ছে। মা'বাদ এই খবর নিয়ে দ্রুত মদীনাএসেছেন মুসলমানদের সাবধান করার জন্যে।

মহানবী (সা) মা'বাদের কাছ থেকে সব শুনলেন।

ডাকলেন তিনি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)-কে পরামর্শের জন্যে। পরামর্শে ঠিক হলো, ফজরেই যুদ্ধযাত্রা করতে হবে। বেলাল (রা)-কে মহানবী (সা) নির্দেশ দিলেন ফজরের আযানের সময় যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা ও অন্যান্য আদেশ সকলকে জানিয়ে দেবার জন্যে।

বেলাল (রা) ফজরের আযান দিলেন এবং সেই সাথে ঘোষণা দিলেন : 'মুসলিম বীরবৃন্দ প্রস্তুত হও, এখনই যুদ্ধযাত্রা করতে হবে। কুরাইশ বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হচ্ছে।' এই সাথে বেলাল মহানবীর (সা)-এর পক্ষ থেকে আরও ঘোষণা করলেন, "গতকালের যুদ্ধে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন, অদ্য কেবল তারাই যুদ্ধে যেতে পারবেন।"

মদীনার ঘরগুলো তখন বিপর্যস্ত। অধিকাংশ আহত সাহাবীর আহত স্থানের রক্ত তখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। ৭০ জন শহীদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কান্না তখনও প্রশমিত হয়নি। ক্লান্তি ও অবসাদে ভেঙ্গে পড়া সকলের দেহ। স্বয়ং মহানবী (সা) আহত। তাঁর কপালে গভীর দু'টি ক্ষত। তাঁর সামনের চারটি দাঁত পাথরের আঘাতে নড়ে যাওয়া।

কিন্তু বেলালের আহ্বান যখন তাদের সকলের কানে গেল, মুহূর্তেই আহত স্থানের বেদনা-যন্ত্রণা কোথায় চলে গেল, শরীরের ক্লান্তি-অবসাদ কোথায় যেন ভেসে গেল। নতুন জীবন নিয়ে মদীনার গোটা মুসলিম পল্লী জেগে উঠলো। চারদিকের শত কণ্ঠের আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে উৎসবের জোয়ার জাগলো মদীনায়।

আগের দিনের রক্ত-রঞ্জিত পোশাক ও রক্তে গোসল করা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ছুটলো সকলে মদীনার মসজিদে নববীর দিকে।

নামায শেষে মহানবী (সা) যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সকলের আগে যাত্রা করলেন। তাঁর পেছনে পায়েহাঁটা ছ'শ' মুসলমানের বাহিনী। মুসলমানদের এই যুদ্ধ-যাত্রার খবর মদীনামুখী কুরাইশ সৈন্যের প্রধান আবু সুফিয়ান পেলে স্তম্ভিত হলো সে। তার মনে হলো মুসলমানরাই যেন কুরাইশদের ধ্বংসের লক্ষ্য নিয়ে আসছে। ভয় পেয়ে গেল আবু সুফিয়ান। আহত সিংহ আরও ভয়াবহ হয়ে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গেই আবু সুফিয়ান তার বাহিনীর গতি মদীনার দিক থেকে মক্কার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

মক্কার মুশরিক বাহিনীর পলায়নের খবর মহানবী (সা) পেলেন। তবু তিনি হামরাউল আসাদ প্রান্তরে ক'দিন অপেক্ষা করে ফিরে গেলেন মদীনায়।

কুরাইশদের নেতৃত্বে ইহুদি এবং গোটা পৌত্তলিক আরব একজোট হয়ে আসছে মদীনা আক্রমণের জন্যে।

মহানবী (সা) সকলের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, এবার মদীনায় অবস্থান করেই মদীনার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

পারস্যের সাহাবী সালমান ফারসির পরামর্শে পরিখা খনন করে মদীনার উপকণ্ঠে শত্রু বাহিনীর গতিরোধ করার সিদ্ধান্ত হলো।

শুরু হলো পরিখা খনন।

মহানবী (সা) তাঁর ৩০০০ সাহাবীকে ১০ জনের এক এক গ্রুপে বিভক্ত করে প্রতি গ্রুপকে দশ গজ গভীর দশ গজ চওড়া পরিখা খননের নির্দেশ দিলেন।

সময় বেশী নেই। দিন রাত অবিরাম পরিখা খনন শুরু হলো। এই খনন কাজে সবাই শ্রমিকে পরিণত হলো। স্বয়ং মহানবী (সা) দশ জনের একটা গ্রুপের সদস্য হলেন।

একদিকে প্রচণ্ড দৈহিক পরিশ্রম, অন্যদিকে প্রকট খাদ্যাভাব। অবস্থা এক সময় এমন দাঁড়াল যে, পরপর কয়েক সন্ধ্যা কারোরই খাবার জুটল না। কোমর সোজা করে দাঁড়ানোও কঠিন হয়ে দাঁড়াল অনেকের। কিন্তু কাজের বিরাম নেই। কোমরকে সোজা ও শক্ত রাখার জন্য আরবীয় রীতি অনুসারে পেটে পাথর বাঁধা হলো।

মহানবীর পেটেও বাঁধা একই পাথর। তাঁর গ্রুপের কয়েকজন মাটি কাটছেন, আর কয়েকজন সে মাটি বহন করছেন। মহানবী (সা) এই বহনকারী দলের একজন হয়ে মাথায় করে মাটি বয়ে নিচ্ছেন।

মহানবীর (সা) এই অবস্থা দর্শনে সংকোচ জরজর, বেদনা-কাতর কোন সাহাবী সাহায্য করতে এলে তিনি হাসি মুখে বিদায় দিচ্ছেন। যার ভার তারই বহন করা দরকার।

দশ গজ গভীর ছয় হাজার হাত দীর্ঘ পরিখা খননের কাজে প্রতিটি সাহাবী তাঁর সর্ব শক্তি, সব আন্তরিকতা ঢেলে দিয়েছেন যেন। কঠোর পরিশ্রমে ভেঙ্গে পড়া তাঁদের দেহ, ক্ষুধার জ্বালায় সকলে অস্থির, পিঠের সাথে লেগে থাকা পেটে পাথর বাঁধা তাঁদের। কিন্তু তাঁদের মুখে ক্লান্তি বা কষ্টের কোন ছাপ নেই। তার জায়গায় তাদের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে সুন্দর এক কোরাস :

আমরা সেই তারা, যারা
মুহাম্মাদের হাতে জিহাদের
বাইয়াত করেছি।

সমস্বর কণ্ঠের এই কোরাস সৃষ্টি করেছে সেখানে উৎসবের এক আমেজ।

খন্দক যুদ্ধের মুহূর্ত। মক্কার কুরাইশদের নেতৃত্বে দশ হাজার মুশরিক সৈন্য মদীনার প্রায় উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে।

একদিকে বাইরে এই বিপদ, অন্যদিকে রয়েছে মদীনার ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী এবং মুনাফিকদের ভেতর থেকে অভ্যুত্থানের আশংকা।

বাইরের আক্রমণকে বাধা দেয়ার জন্য পরিখা খনন করা হয়েছে।

ভেতরের ইহুদী মুনাফিকদের অভ্যুত্থান রোধের জন্যে মহানবী (সা) ছালমা ইবনে আছলাম ও যায়েদ ইবনে হারেসার নেতৃত্বে দুটি নগর রক্ষা বাহিনী গঠন করলেন। ছালমার বাহিনীতে দু'শ' আর যায়েদের বাহিনীতে থাকল তিনশ' লোক। ভেতরের যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের দায়িত্ব দেয়া হলো এই দু'টি দলের উপর।

দশ হাজার মুশরিক সৈন্য যখন মদীনার উপকণ্ঠে পৌছল, তাদের রণহুংকার, তাদের নানারকম আস্ফালন আর চিৎকারে ছোট শহর মদীনায় এক ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করলো।

মুসলিম সেনা দলে পনের বছরের বালকদের শামিল করার পরেও মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র তিন হাজার। নারী ও শিশুদের নগরীর এক প্রান্তে এক সুরক্ষিত বাড়ীতে আশ্রয় দেয়া হয়েছে।

মহানবী (সা) সর্বসাকুল্যে আড়াই হাজার সৈন্য নিয়োগ করতে পারলেন পরিখা রক্ষা ও পরিখা অতিক্রমে শত্রুদের বাধা দেয়ার জন্য।

মদীনার আকাশ বাতাস তখন কাঁপছে মহা বিপদের ঘনঘটায়।

মহানবী (সা) প্রতিরক্ষার আশু ব্যবস্থাগুলো সম্পন্ন করার পর অন্যদিকে মনোযোগ দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় খবর এল, মদীনার ইহুদি গোত্র বনি কোরাইজাও বিদ্রোহ করেছে।

সমগ্র মদীনায় মুসলমানরা ছাড়া এই একমাত্র বনি কোরাইজা সন্ধিসূত্রে মুসলমানদের মিত্র ছিল। অন্য দুই ইহুদি গোত্র আগেই মুশরিক পক্ষে যোগ

দিয়েছে। বনি কোরাইজা বিদ্রোহ করার পর মদীনায় মুসলমানদের মিত্র বলতে কেউ আর থাকলো না।

এই খবর মুসলমানদের জন্য খুবই বেদনাদায়ক হল। সর্বশেষ একটি বড় আঘাত হিসেবে খবরটি মুসলমানদের অন্তরকে যেন ক্ষত-বিক্ষত করে দিল।

যেন তারা ভেতর ও বাইরে থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল।

সকলের মুখেই তখন মহাবিপদের এক কাল ছায়া। কিন্তু মহানবী (সা)-এর মুখে কোনই ভাবান্তর নেই। বার্তা-বাহকের মুখ থেকে খবর শোনার পরেই শান্ত, অথচ অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, ভয় কি, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি একাই সকলের পক্ষে যথেষ্ট। মহানবীর (সা) এই একটি বাক্য যেন সকলের দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের কাজ করল।

সমবেত কণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনি মুহূর্তের জড়তা-উদ্বেগ কোথায় যেন দূর করে দিল।

খন্দকের যুদ্ধ।

পরিখার ওপারে দশ হাজার মুশরিক সৈন্য। আর এপাড়ে প্রতিরোধের জন্য দাঁড়ানো আড়াই হাজার মুসলিম।

মদীনায় প্রবেশের মুখে পরিখা দেখে মুশরিক বাহিনী বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কারণ পরিখা খনন করে প্রতিরোধের কৌশলের সাথে আরবরা পরিচিত নয়। বিমূঢ় ভাব তাদের কেটে যাবার পর তারা অস্থির হয়ে পড়ল। পরিখা অতিক্রমের জন্যে অগভীর ও প্রশস্ত কোন জায়গা তারা তালাশ করতে লাগল। পাহাড়ের কিনারে যেখানে পরিখা শেষ হয়েছে, সেখানে এমন একটি সুবিধামত জায়গা তারা পেয়ে গেল।

তারা পরিকল্পনা করল এই পথে তারা দুর্ধর্ষ ও অজেয় একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করবে। তারা ওপাড়ে গিয়ে পরিখার এই অংশকে শত্রুমুক্ত রাখবে এবং সেই সুযোগে অবশিষ্ট সৈন্য ঐ পথে নগরে প্রবেশ করবে।

তারা ক্ষুদ্র বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নির্বাচন করল আরবের সর্বজনবিদিত শ্রেষ্ঠ বীর আমর ইবনে আব্দে ওদ্দ এবং অমিত সাহসী তরুণ সেনাধ্যক্ষ ইকরামা ইবনে আবু জেহেলকে। আরবের মানুষের সাধারণ ধারণা, আমর একাই এক হাজার যোদ্ধার সাথে লড়াই করে জিততে পারবে।

আমর প্রথমে তার ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে পরিখা অতিক্রম করল। তারপর অন্যান্যরা।

আমর ওপাড়ে পার হয়েই ভয়াল আকারে তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল, কে আছ যোদ্ধা, সাহস থাকলে এগিয়ে এসো আমরের সামনে।

একেতো শত্রুর একটি দল পরিখা অতিক্রমে সমর্থ হয়েছে! তার উপর পরিখা অতিক্রম করেছে আমর-এর মত পালোয়ান। প্রথমটায় মুসলমানরা চমকে গিয়ে কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। সে কারণেই আমর প্রথম দিকে তার আস্ফালনের কোন জবাব পেল না।

আমরের তর্জন-গর্জন অব্যাহত। আহ্বান জানাচ্ছে কাউকে সে যুদ্ধের। 'এই যে আমি আছি' বলে শেরে খোদা হযরত আলী বেরিয়ে এলেন। আমরের তুলনায়

হযরত আলী বালক-সদৃশ। আমর মহাবীর ও বহুদর্শী এক বিশাল পালোয়ান। আর হযরত আলী মাত্র এক নব্য তরুণ। মহানবী (সা) হযরত আলীকে লক্ষ্য করে ত্বরিত কণ্ঠে বললেন, 'জানো তো, সে আমর।'

হযরত আলী ঘুরে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বললেন, 'সে আমর, আমিও আলী।'

বলেই হযরত আলী মহানবীর অনুমতি নিয়ে উলংগ তরবারী হাতে ছুটলেন অমরের দিকে। শুরু হলো যুদ্ধ। মুহূর্তেই ধুলায় অন্ধকার হয়ে গেল স্থানটা। অস্ত্রের ঝনঝনানি ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না কারও। ভয়াবহ এই যুদ্ধের একদিকে শক্তি, অন্যদিকে ঈমানের তেজ। শক্তির সাথে ঈমানের তেজের লড়াই। মহানবীর (সা) কণ্ঠে তখন করুণ প্রার্থনা, হে আল্লাহ, বদর যুদ্ধে ওবায়দাকে গ্রহণ করেছ, ওহোদের অনল পরীক্ষায় হামজাকে তুমি নিয়েছ, আর এই আলী তোমার সন্নিধানে উপস্থিত। সে আমার পরমাত্মীয়। আমাকে একদম স্বজন-বর্জিত করো না।

মুসলমানরা বাক্‌হীন রুদ্ধশ্বাসে ধুলায় অন্ধকার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে। তাদের উদ্বিগ্ন, অচঞ্চল চোখ অপেক্ষা করছে ফলাফলের।

এক সময় ধুলায় অন্ধকার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আল্লাহু আকবার নিনাদ ধ্বনিত হলো হযরত আলীর কণ্ঠে। সংগে সংগে সহস্র কণ্ঠে আবেগ আনন্দ-আপ্লুত প্রতিধ্বনি উঠল, আল্লাহু আকবার।

এই বিজয় আনন্দের বন্যাবেগ সৃষ্টি করল মুসলমানদের মধ্যে।

খন্দকের যুদ্ধ চলছে। আরব-খ্যাত বীর আমর হযরত আলীর হাতে নিহত এবং ইকরামা ইবনে আবু জেহেল ব্যর্থ হবার পর এবার মক্কায় মুশরিক সৈন্যের শেষ বড় ভরসা খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এগিয়ে এলেন।

খালিদ বাছাই করা সৈন্য নিয়ে একটা অজেয় বাহিনী গঠন করলেন। দীর্ঘ পরিখা পর্যবেক্ষণ করার পর খালিদ আক্রমণের জন্যে সে স্থানটিই বেছে নিলেন যেখানে মহানবী অপেক্ষা করছেন।

তার কৌশল হলো, মহানবীর (সা) অবস্থান স্থলে যদি আকস্মিক সর্বাত্মক আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করা যায়, যদি কোনভাবে মহানবীর অবস্থান এলাকায় বিপর্যয় ঘটানো যায়, তাহলে মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত ও দুর্বল করা যাবে এবং সেই সুযোগে অরক্ষিত এ স্থান দিয়ে পরিখা অতিক্রম করা সম্ভব হবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে দুর্ধর্ষ সেনাপতি খালিদ তার কথিত 'অজেয়' বাহিনী নিয়ে আকস্মিকভাবে প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করলেন মহানবীর অবস্থান স্থলের উপর।

ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। খালিদের লক্ষ্য হলো পরিখার তীর থেকে মহানবীর বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে তাদের পরিখা পাড় নিরাপদ করা, আর মুসলিম বাহিনীর চেষ্টা মুশরিক বাহিনীকে পরিখার তীর থেকে দূরে রাখা।

আক্রমণের বিরতি নেই। আক্রমণের ঢেউ একের পর এক এসে আঁছড়ে পড়ছে। এ যেন সাগরে অফুরন্ত ঢেউ-এর অব্যাহত আঘাত।

যুদ্ধ এমন এক ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছল যে, মহানবী (সা) এবং তার সাথীরা নামায পড়ার সময় পর্যন্ত কেউ বের করতে পারলেন না।

খালিদ এভাবে তাঁর আক্রমণ কয়েকদিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখলেন। কিন্তু শেষে তাঁর 'নির্বাচিত দুর্ধর্ষ' সৈন্যরা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু পরিখার ওপারে মুসলমানরা তখনও অস্ত্র উচিয়ে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ সেদিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে ভাবতে বাধ্য হলেন, পরিখা রক্ষাকারী মুসলিম সেনা-প্রাচীর ভেদ করা বা ভাঙ্গা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং পরিখা পার হবারও তাদের কোন সুযোগ নেই।

খন্দক যুদ্ধের একটি মুহূর্ত।

মদীনার আনসার প্রধান সা'আদ ইবনে মা'আজ বিশেষ এক কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

মনে তাঁর আনন্দ। পরিখা মুশরিক বাহিনীকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। ওদের তর্জন-গর্জন এখন সবই ওপাড়ে। সংখ্যার জোরে মুহূর্তে মুসলমানদের পিষে ফেলার পর্বতপ্রমাণ অহংকার নিয়ে ওরা ছুটে এসেছিল। দশহাত গভীর ৬ হাজার হাত দীর্ঘ পরিখায় ওদের অহংকার এসে থুবড়ে পড়েছে।

নিশ্চিন্ত মনে কাজ করছিলেন সা'আদ ইবনে মা'আজ।

হঠাৎ আগুনের মত ছড়িয়ে পড়া খবর সা'আদ ইবনে মা'আজও শুনলেন। মুশরিক বাহিনী সর্বাত্মক এক আক্রমণ পরিচালনা করেছে। ওরা পরিখা পার হওয়ার চেষ্টা করছে।

খবর শোনার সাথে সাথে সা'আদ উঠে দাঁড়ালেন। পাশ থেকে বর্শা তুলে নিয়ে ছুটলেন তিনি পরিখার পাড়ে।

তিনি ছুটছেন আর আবৃত্তি করছেন একটা কবিতার অংশ :

একটু অপেক্ষা কর, মানুষ আসিতেছে,

সময় পূর্ণ হইলে মরণ তো আসিবেই, সুতরাং মরণে আর ভয় কি?

পাশেই সা'আদ ইবনে মা'আজের বাড়ি।

মা'আজের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে তার মা বেরিয়ে এলেন। দেখলেন সা'আদকে এবং শুনলেন খবরও।

শুনেই উত্তেজিত ও আবেগময় কণ্ঠে সা'আদের মা সা'আদকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বললেন, 'বৎস পিছিয়ে পড়েছো, দ্রুত অগ্রসর হও।'

মায়ের উৎসাহ ও আশীর্বাদে দ্রুততর হলো সা'আদ ইবনে মা'আজের গতি।

তিনি পরিখা তীরে পৌছতেই শত্রুপক্ষের একটা তীর এসে বিদ্ধ করল তাঁকে। গুরুতর আহত হলেন তিনি।

এই আঘাত তাকে শাহাদাতের দিকে নিয়ে গেল।

অচিরেই শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করলেন তিনি।

যে যুদ্ধ অস্ত্রের নয় ধৈর্যের

মক্কা বিজয়ের অনেক আগের ঘটনা।

হোদায়বিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধটা অস্ত্রের নয়, ধৈর্যের। দুর্বলরা অপমান, অবমাননা বাধ্য হয়ে সহ্য করে। কিন্তু শক্তিমান, সামর্থবানরা অপমান, অবমাননা সহ্য করে সংযত থাকা অস্ত্রের যুদ্ধে জেতার চেয়ে কঠিন।

এই কঠিন যুদ্ধেরই মুখোমুখি হলো মুসলমানরা হোদায়বিয়ায়।

হজ্বের জন্যে মক্কার দ্বার শত্রু-মিত্র সকলের জন্যে উন্মুক্ত, এটাই আরবের প্রচলিত প্রথা। কিন্তু মুসলিম হজ্বযাত্রীদের মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হলো না। কুরাইশ ছাড়া মক্কার আশেপাশের অন্যান্য গোত্র কুরাইশদের এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়নি তবুও।

উপরন্তু, নিরস্ত্র প্রায় মুসলমানদের উপর চড়াও হবার জন্যে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও ইকরামা ইবনে আবু জেহেলের নেতৃত্বে কয়েকশ' কোরাইশ সৈন্য ঝড়ের বেগে অগ্রসর হলো মুসলমানদের উদ্দেশ্যে।

মহানবী (সা) যুদ্ধ এড়াবার জন্যে ভিন্ন পথ দিয়ে মক্কার সন্নিকটে হোদায়বিয়া প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হলেন।

এই বৈরিতার উত্তরে মহানবী (সা) কুরাইশ সর্দারদের কাছে শান্তির প্রস্তাব পাঠালেন এবং তাদের পক্ষ থেকে একজন আলোচনাকারীকে আহ্বান করলেন।

কোরাইশদের পক্ষ থেকে একজন আলোচনাকারী এলেন। এলেন বটে, কিন্তু শান্তির জন্যে নয়, গণ্ডগোল পাকানোর লক্ষ্যে। কুরাইশ সর্দার উরওয়া এমন আচরণ করলেন এবং এমন সব কথা বললেন যে, সেই অপমান ও অবমাননা হযরত আবু বকরের পক্ষেও হজম করা সম্ভব হলো না। কঠোর ভাষায় তিনি উরওয়াকে আক্রমণ করলেন।

উরওয়া চলে গেলেন।

পরে মহানবী (সা) তাঁর শান্তি ও শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে নিজের প্রিয় উটে চড়িয়ে খেরাশ নামক সাহাবীকে পাঠালেন মক্কায় শান্তির প্রস্তাব নিয়ে। মক্কার লোকেরা মহানবীর এই শুভেচ্ছার জবাব দিলেন হযরতের উটকে হত্যা করে।

খেরাশকেও তারা হত্যা করতে যাচ্ছিলো। মক্কার পাশের এক গোত্র সর্দার তাকে বাঁচিয়ে নিরাপদে ফেরত পাঠালেন হোদায়বিয়ায়।

ঠিক এই সময়েই মক্কার একটি গুপ্ত ঘাতক দল মুসলমানদের একটা অংশের উপর চড়াও হতে এলো। তারা সবাই গ্রেফতার হলো কিন্তু মহানবী (সা) তাদের সঙ্গে সঙ্গেই মক্কায় ফেরত পাঠালেন।

পরে মহানবী (সা) হযরত উসমান (রা)-কে শান্তির বার্তা নিয়ে পাঠালেন মক্কায়। মক্কার লোকেরা তাঁকে বন্দী করলো।

মহানবীর কাছে খবর এলো উসমানকে হত্যা করা হয়েছে। গর্জে উঠলো দেড় হাজার মুসলমানের ক্ষুদ্র বাহিনী। তারা মহানবীর হাতে হাত রেখে শপথ নিলো 'মৃত্যুর জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধ করবো, কোন অবস্থায়ই একপদ পশ্চাৎবর্তী হবো না, আল্লাহর নামে আমাদের এই প্রতিজ্ঞা।'

কোরাইশরা মুসলমানদের চেনে। এই শপথের খবর মক্কায় পৌঁছার সাথে সাথে তাদের বীরত্বের আগুনে পানি পড়লো। উসমান (রা)-কে ছেড়ে দিয়ে তাঁর সাথেই সন্ধির বার্তা নিয়ে লোক পাঠালো মহানবীর কাছে।

হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হলো। সন্ধির শর্ত অনুসারে মুসলমানদের এবার হজ্ব না করে ফিরে যেতে হবে। এছাড়া সন্ধির অন্যসব শর্তও সম্পূর্ণভাবে কোরাইশদের পক্ষে গেলো। এই সন্ধি সকল মুসলমানের মনে অপমানের অসহ্য জ্বালা ধরিয়ে দিলো। হযরত উমরের মত মহানবীর অতি ঘনিষ্ঠ সাথীর কণ্ঠেও উত্তেজিত প্রতিবাদ উঠলো।

কিন্তু এরপরও মহানবীর নির্দেশ সবাই ভগ্ন হৃদয়ে মেনে নিলো।

অসহ্য অপমান, অবমাননার বিরুদ্ধে ধৈর্যের জয় হলো। যে পরীক্ষা মুসলমানদের মক্কার ১৩ বছরে দিতে হয়নি, যে পরীক্ষা তাদের বদর, ওহোদ ও খন্দক যুদ্ধেও দিতে হয়নি, সেই পরীক্ষা তাদের দিতে হলো হোদায়বিয়ায়।

পরীক্ষা যেন তাদের সম্পূর্ণ হলো।

তাই বোধহয় হোদায়বিয়ার সন্ধির পর মুসলমানদের 'মহাবিজয়' (ফাতহুম্ মুবিন)-এর খোশ খবর এলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তরফ থেকে।

এক বিপদ যায়, আরেক বিপদ আসে।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর কোরাইশদের দিক থেকে মহানবী (সা) নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু বিপদ ছুটে এল ইহুদীদের দিক থেকে।

ষড়যন্ত্রকারী ও চির মুসলিম-বিদ্বেষী ইহুদীরা যখন বুঝলো মক্কার কুরাইশদের আর শক্তি নেই মুসলমানদের ধ্বংস করার, তখন খায়বরের ইহুদী গোত্রগুলো পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী গাতফান ও অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্রকে নানা প্রকার আশা ও প্রলোভন দেখিয়ে তাদের মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করলো।

তারা মুসলমানদের উত্যক্ত ও দুর্বল করার জন্য মুসলমানদের একটা বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করে অনেককে হতাহত করল এবং সবকিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। এর কিছুদিন পর আরও দুঃসাহসী হয়ে তারা মদীনার উপকণ্ঠে জ-ফারাদ প্রান্তরে মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবাদের পশুপালে আক্রমণ চালিয়ে প্রহরী এক মুসলমানকে হত্যা করে লোকটির স্ত্রীসহ গোটা পশুপালকে লুট করে নিয়ে গেল।

মহানবী (সা) গুপ্তচর পাঠিয়ে খবর নিয়ে জানলেন, ইহুদী ও গাতফানীরা মদীনা আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত। যে কোন সময় তারা মদীনার উপর আপতিত হতে পারে।

মহানবী (সা) আর মুহূর্ত দেরী করলেন না। ওরা মদীনা আক্রমণের আগেই ওদের ঘাঁটি খায়বর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

মহানবী (সা) ১৪শ' পদাতিক ও দু'শ' সওয়ারী নিয়ে খায়বর যাত্রা করলেন। তিনি এমনভাবে তাঁর বাহিনী পরিচালনা করলেন যাতে গাতফানীদের থেকে খায়বরের ইহুদীদের বিচ্ছিন্ন করা যায়। তাই হলো। গাতফানীরা মনে করল মুসলমানরা তাদের ফাঁদে আটকাবার চেষ্টা করছে। তারা ভয়ে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে তাদের এলাকায় দুর্গে আশ্রয় নিল।

ইহুদীরাও সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে খায়বরে তাদের সুরক্ষিত দুর্গে গিয়ে প্রবেশ করল এবং মিত্র গাতফানীদের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগল।

তারা আরও ভাবল, দুর্গ অবরোধ করে মুসলমানরা তাদের কাবু করতে পারবে না। বেশীদিন দুর্গ অবরোধ করে বসে থাকার মত রসদ মুসলমানদের নেই।

ইহুদীদের এই হিসাব সত্য। মুসলমানদের তখন খুবই আর্থিক দুর্দিন।

মুসলমানরা মাত্র কিছু ছাতু সম্বল করে খায়বর অভিযানে এসেছিল। সে ছাতু ক'দিনেই নিঃশেষ হয়ে গেল।

অনাহার-অর্ধাহারের কালছায়া নেমে এল মুসলিম শিবিরে। অবরোধের সময় যত বাড়ল, মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। তার উপর দুর্গ প্রাকার থেকে ইহুদীরা মাঝে মাঝেই তীর, বর্ষা, পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ করে মুসলমানদের হতাহত করতে লাগল। ইহুদীদের ধারণা হলো, অনাহার-অর্ধাহারে মুসলমানরা বিপর্যস্ত হয়ে অচিরেই অবরোধ উঠিয়ে পালিয়ে বাঁচবে।

এদিকে মহানবী (সা) যখন দেখলেন যে, ইহুদীরা কোন মতেই আত্মসমর্পণ বা সন্ধি করবে না, তখন একদিন তিনি সাথীদেরকে দুর্গ দখলের নির্দেশ দিলেন।

এই নির্দেশ অমৃত হয়ে দেখা দিল মুসলমানদের জন্য। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা তারা ভুলে গেল। মুহূর্তেই দুর্বল শরীর তাদের সবল হয়ে উঠল।

শুরু হলো ঘোরতর যুদ্ধ।

একের পর এক ইহুদী দুর্গে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হতে লাগল।

ইহুদীদের সর্ব বৃহৎ দুর্গ কা'মুছ। তিনদিন যুদ্ধ চালাবার পর মুসলমানরা এ দুর্গ দখল করে নিল। কা'মুছ দুর্গের পতনের পর এক সপ্তাহের মধ্যে খায়বরের সকল ইহুদী দুর্গের পতন ঘটল।

যুদ্ধে মুসলমানরা যে কতটা দক্ষতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, যুদ্ধের ফলাফল থেকেই তা আঁচ করা যায়। ৪ সপ্তাহের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন ১৫ জন মুসলিম, আর অন্যপক্ষে মারা গিয়েছিলেন ৯৩ জন ইহুদী।

অনাহার, অর্ধাহার আর সংখ্যা স্বল্পতা মুসলমানদের বিজয় ঠেকাতে পারেনি। আর প্রাচুর্য, সংখ্যাধিক্য এবং সুরক্ষিত দুর্গ পারেনি ইহুদীদের বিজয় দিতে।

মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীরা বার বার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নানারকম ষড়যন্ত্র তারা অবিরাম করে গেছে। খন্দক যুদ্ধের আয়োজন প্রকৃতপক্ষে তারাই করেছিল। আরবের দশ হাজার সৈন্য তারা ডেকে এনেছিল মুসলমানদের ধ্বংসের জন্যেই। সে আয়োজন যখন ব্যর্থ হলো, তখন খায়বরকে কেন্দ্র করে অন্যান্য গোত্রের সাহায্য নিয়ে নিজেরাই মদীনা থেকে মুসলমানদের মুছে ফেলার আয়োজন করেছিল।

কিন্তু খায়বর যুদ্ধেও তারা পরাজিত হলো।

জাগতিক নিয়মে এবং তদানীন্তন আরবের প্রচলিত নিয়মে উচিত ছিল ইহুদীদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, তাদের সক্ষম পুরুষদের হত্যা করা এবং অন্যান্যদের দাসে পরিণত করা।

কিন্তু মহানবী (সা) ইহুদীদের সাথে যে ব্যবহার করলেন তখন পর্যন্ত জগতের ইতিহাসে তার কোন তুলনা ছিল না।

যুদ্ধ শেষে মহানবী (সা) ঘোষণা করলেন :

(ক) ইহুদীরা আগের মতই স্বাধীনভাবেই ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারবে। কেউ কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না।

(খ) তাদেরকে কোন যাকাত, ওশর দিতে হবে না, যা মুসলমানরা দিয়ে থাকে।

(গ) তাদেরকে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা হবে না।

(ঘ) তাদের বাড়িঘর, জমিজমা পূর্বের ন্যায় তাদেরই অধিকারে থাকবে।

(ঙ) তাদের কতকগুলো দুর্গের স্বর্ণ ও রৌপ্য স্পর্শ করা হবে না।

(চ) তবে দেশের সমস্ত জমির মালিকানা মদীনা রাষ্ট্রের অধীন থাকবে। জনগণ জমির শস্যের একটা ভাগ মদীনার সরকারকে দেবে এবং

(ছ) ভাগ আগের মতই অর্ধাংশ হবে।

এই ঘোষণা যখন হলো, তখন ইহুদীদেরই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল। তাদের সীমাহীন বৈরিতার বিনিময়ে এই বদান্যতা পাবে, কল্পনাও করতে পারেনি তারা।

বিষের পরাজয় বিশ্বাসের জয়

খায়বর যুদ্ধ তখন শেষ।

মহানবী (সা) তখনও খায়বরে।

ভেতরে ভেতরে ইহুদীরা পাগল হয়ে গেছে কিছু করার জন্যে।

ইহুদীদের একটা গ্রুপ সিদ্ধান্ত নিল মহানবী (সা)-কে হত্যা করার। ঠিক হলো বিষ খাওয়ানোই সবচেয়ে নিরাপদ।

পরিকল্পনা অনুসারে ছাগল জবাই করে রান্না করা গোশতে তীব্র বিষ মেশানো হলো, যার ফোঁটা পরিমাণ গলাধঃকরণ করলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মৃত্যু ঘটবে।

মহানবী (সা) ছাগলের রানের গোশত বেশী পছন্দ করতেন। সেই রানের গোশতে অধিক পরিমাণে বিষ মেশানো হলো।

যয়নাব নামে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ইহুদী মেয়ে আরও কয়েকজনকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা)-এর কাছে এসে বলল, 'আপনার জন্যে এই সামান্য হাদিয়া এনেছি। আপনি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করবেন কি?'

মহানবী (সা) ধন্যবাদের সাথে হাদিয়া গ্রহণ করলেন এবং উপস্থিত সাহাবাদের সাথে নিয়ে খেতে বসলেন।

তিনি এক টুকরো গোশত খেয়েই সাহাবাদের উদ্দেশ্যে দ্রুত বললেন, 'গোশতে বিষ মোশানো আছে, খেওনা কেউ।'

কিন্তু বিশর নামের একজন সাহাবী তখন এক টুকরার কিছু অংশ গিলে ফেলেছিলেন।

সংগে সংগেই তাঁর দেহে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। দেহ তার বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগল। বিষের যন্ত্রণায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন।

মহানবী (সা) যয়নাব ও তার সাথীদের ডেকে তাদের কৃত অপরাধের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

যয়নাব উদ্যত কণ্ঠেই বলল, 'আপনাকে হত্যা করার জন্যে এটা করেছি।' আর

তার সাথী ইহুদীরা ধূর্ততার সাথে বলল, 'আমরা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম, তুমি যদি ভণ্ড হও, তাহলে বিষ তোমার জিহ্বা স্পর্শ করার সাথে সাথে তোমার মৃত্যু ঘটবে। আর যদি সত্যিই নবী হও, তাহলে বিষ তোমার কিছু করতে পারবে না।'

চারদিকে দাঁড়ানো সাহাবীরা ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্রে ক্রোধে তখন আগুন। তারা বলল, 'এদের হত্যা করার অনুমতি কি আমরা পাব না?'

মহানবী (সা) তাদেরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন। তাঁর নিজের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ কখনও তিনি নেন না, এ জন্যে কাউকে কোন দণ্ডও কখনও তিনি দেন না।

যয়নাব উদ্যত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু শীঘ্রই তার ভাবান্তর ঘটতে লাগল। সে মনে করেছিল তখনই তাদের গর্দান চলে যাবে, হত্যা করা হবে তাদের সংগে সংগেই। সাহাবাদের প্রতি ধৈর্য ধারণের উপদেশ, প্রতিশোধ না নেবার মহানবীর কথায় সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত, সাহাবী বিশরের চেয়ে অনেক বেশী গোশত মহানবী (সা) খেয়েছেন। কিন্তু বিশর যেখানে মুমূর্ষু, সেখানে মহানবী সুস্থ। তাঁর ঠোঁট দু'টি বিবর্ণ হওয়া ছাড়া বিষের আর কোন প্রতিক্রিয়া তাঁর দেহে নেই। এই চিন্তা যয়নাবের মনকে ওলট-পালট করে দিল।

সর্বোপরি যয়নাব যখন দেখল, তাদের হত্যা তো দূরে গ্রেফতারও করা হলো না, তখন যয়নাব আর স্থির থাকতে পারলো না। মুহূর্তে তার হৃদয় থেকে সব বিদ্বেষ কোথায় যেন দূর হয়ে গেল। তার জায়গায় তার হৃদয়ে নামল মহানবীর প্রতি ভক্তি, মমতার অঢেল প্রস্রবণ। সে লুটিয়ে পড়ল মহানবীর পায়ে এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করে ইসলামে দাখিল হয়ে গেল।

হত্যা করতে এসে নতুন জীবন পেল যয়নাব, নতুন মানুষ হয়ে গেল সে।

কিন্তু তার সৌভাগ্যের জীবন স্থায়ী হলো না। বিষক্রিয়ার ফলে তিনদিন পরে সাহাবী বিশর-এর মৃত্যু ঘটলে হত্যার অপরাধে যয়নাব প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

আমর ইবনে 'আস ছুটছেন মরু পথ ধরে মদীনার দিকে। আমর মক্কার একজন প্রথিতযশা যোদ্ধা এবং দূরদর্শী একজন রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত। আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর দরবার থেকে হিজরতকারী মুসলমানদের ধরে আনার কঠিন কূটনৈতিক কর্মে কুরাইশরা তাকেই পাঠিয়েছিল আবিসিনিয়ায়।

এই আমর আজ তাঁর বাড়ী-ঘর, সহায়-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন সব মক্কায় ফেলে দেহের পোশাকটুকু মাত্র সম্বল করে ছুটছেন মদীনায়।

অনেকটা পথ এগুবার পর এক জায়গায় হঠাৎ তাঁর সাক্ষাত ঘটলো খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও ওসমান ইবনে তালহার সাথে। চমকে উঠলেন আমর, চমকে উঠলেন খালিদ এবং ওসমানও। উভয়পক্ষের কাছে তাদের এই সাক্ষাত যেন অকল্পনীয় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং ওসমান ইবনে তালহা দু'জনেই আমরের মতই মক্কার বিখ্যাত ব্যক্তি। খালিদ অদ্বিতীয় বীর এবং অজেয় সেনাপতি হিসেবে আরবে পরিচিত। আর ওসমান ইবনে তালহা মক্কার মহাসম্মানিত ব্যক্তি। তিনি কা'বার প্রধান মুহাফেজ এবং বায়তুল্লাহর সকল চাবি তাঁরই জিম্মায় থাকে।

এঁদের মুখোমুখি হয়ে আমর নিজের বিস্ময় কিছুটা সামলে নেবার পর খালিদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'খালিদ! কতদূর?'

খালিদ একজন নির্ভীক যোদ্ধা। কিন্তু তিনিও চমকে উঠেছিলেন আমরের অপ্রত্যাশিত দর্শনে। খালিদ জানেন না, আমরের কি মতলব, কোথায় যাচ্ছে। সে যাই হোক খালিদের বীর হৃদয় সায় দিলো না সত্য গোপন করতে। খালিদ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'যাচ্ছি মদীনায়। জেদের বশবর্তী হয়ে অসত্যের পূজা করতে করতে মন হাঁপিয়ে উঠেছে। আর সহ্য করতে পারছি না। তাই মদীনায় চলেছি প্রকাশ্যে সত্যকে স্বীকার করতে, আগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।'

বলে একটু দম নিলেন খালিদ। তারপর আমরকে লক্ষ্য করে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমর, আর কতদিন, নিশ্চয় জেনো এই ব্যক্তি (মহানবী) সত্যবাদী। তিনি নিশ্চয় আল্লাহর নবী। আমি ও আমার সঙ্গী ওসমান এই উদ্দেশ্যেই মদীনা যাত্রা করেছি।'

আমরের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। উৎসাহ-উদ্দীপনায় নেচে উঠলো মুখমণ্ডল। বললেন আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে, আমিও তো একই উদ্দেশ্যে মদীনা যাত্রা করেছি।

দুই কাফেলা এক হয়ে এক মহানন্দে ছুটলো মদীনার দিকে।

ফাতহুম্ মুবিন-এর এক জ্বলন্ত চিত্র যেন এটা।

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর পর পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজের দরবারে চিঠি দিয়ে দূত প্রেরণ করলেন মহানবী (সা)।

মহানবীর চিঠি কোন সম্রাটের দরবারে যে অমর্যাদার শিকার হয়নি, সেটাই ঘটল পারস্যে। সম্রাট খসরু চিঠি পেয়ে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং চিঠি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। শুধু তাই নয়, ইয়ামেনে তাঁর শাসনকর্তাকে লিখে পাঠালেন, চিঠি পাওয়া মাত্র মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদকে গ্রেফতার করে পারস্য সম্রাটের দরবারে পাঠানো হোক।

চিঠি পেয়ে ইয়ামেনের শাসনকর্তা 'বাজান' গ্রেফতারী পরওয়ানা ও উপযুক্ত সৈন্যসহ দু'জন রাজ-কর্মচারীকে মদীনা পাঠালেন।

রাজকর্মচারীদ্বয় যথাসময়ে মদীনায় মহানবীর দরবারে পৌঁছলেন। গ্রেফতারী পরওয়ানা দেখিয়ে তাদের একজন মহানবীকে বললেন, স্বেচ্ছায় ত্বরিত হাজির হলে গভর্নর সাহেব তার পক্ষে ভাল সুপারিশ করতে পারেন। মহানবী (সা) তাদের সাথে কিছু কথাবার্তা বলে তাদেরকে পরদিন সকালে আসতে বললেন।

পরদিন সকালে ওঁরা এলেন।

মহানবী ওদের বললেন, 'খসরু পারভেজ নিহত। তাঁর ছেলে শেরওয়াহ তাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেছে। যাও, তোমরা ফিরে গিয়ে 'বাজান'-কে এই সংবাদ দাও। নিশ্চয় জেন, ইসলাম শীঘ্রই খসরু পারভেজের সিংহাসনের উপর অধিকার বিস্তার করবে। আর 'বাজান'-কে বলো, সে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে তার পদে বহাল রাখব।

রাজকর্মচারীদ্বয় এই অবিশ্বাস্য সংবাদ শুনে স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছুটল ইয়ামেনে তাদের শাসনকর্তা 'বাজান'-এর কাছে।

ইয়ামেনের শাসনকর্তা 'বাজান' তাঁর কর্মচারীর কাছে সবশুনে উদ্বেগ ও বিস্ময়

ভরা কণ্ঠে বলল, এমন স্পষ্ট অনাবিল ভবিষ্যদ্বাণী তো বাইবেলে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে বুঝব যে, মুহাম্মাদ যথার্থই আল্লাহর নবী। ঠিক আছে কয়দিন অপেক্ষা করা যাক, পারস্য থেকে কোন খবর আসে কিনা।

খুব শীঘ্রই 'বাজান'-এর উন্মুখ অপেক্ষার অবসান ঘটল। 'বাজান'-এর কাছে পারস্যের নতুন সম্রাট শেরওয়াহের ফরমান এল। যাতে বলা হলো– 'খসরুকে তার অন্যায় আচরণের জন্যে হত্যা করে আমি সিংহাসনে অধিপতি হয়েছি। ইয়ামেনবাসীকে আমার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করবে। আর মক্কার সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছু করবে না।'

ফরমান পড়ার পর আর কালবিলম্ব না করে ইয়ামেনের শাসনকর্তা 'বাজান' ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং অল্পকাল পরেই ছুটলেন মদীনায় মহানবীর মহাদর্শন লাভের আকুল বাসনায়। কিন্তু তাঁর বাসনা অতৃপ্তই রয়ে গেল। পথিমধ্যে তিনি শহীদ হলেন গুপ্ত ঘাতকের হাতে।

বাসরার রাজার কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দূত উমাইর ইবনে হারেসকে প্রেরণ করেন মহানবী (সা)।

পথে 'মুতা' নামক স্থানে একজন খৃস্টান আঞ্চলিক শাসনকর্তা শুরাহ্বিল উমাইরকে বন্দী করে তাকে হাত-পা কেটে অশেষ কষ্ট দিয়ে হত্যা করল।

শুধু 'দূত' হত্যাই নয়, সে লক্ষাধিক সৈন্য যোগাড় করে মদীনা আক্রমণের দুরভিসন্ধি আঁটতে লাগল। রোম সম্রাটের কাছ থেকেও আশু সাহায্যের ঘোষণা সে পেয়ে গেল।

'দূত' হত্যার খবর এবং খৃস্টানদের সমরায়োজনের কথা মহানবীর কাছে পৌঁছলে মহানবী (সা) সঙ্গে সঙ্গেই তিন হাজার সৈন্যের একটা বাহিনী মুতায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

এই বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন যায়েদ ইবনে হারেসাকে। তিনি বলে দিলেন, যায়েদ নিহত হলে আলীর ভাই বীরবর জাফর সেনাপতি হবেন। আর জাফর নিহত হলে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা।

মহানবীর আশংকা শুধু আশংকা নয়, এক দেদীপ্যমান সত্য। সুতরাং বাহিনীটি যে কি ভয়াবহ এক যুদ্ধের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তা আঁচ করা বাকী রইল না মহানবীর কথা থেকে।

তাই বোধ হয় মদীনার অধিবাসীরা এই যুদ্ধযাত্রাকে খুবই গুরুত্ব দিল। সেনাদলের যাত্রার সময় মহানবী (সা) স্বয়ং এবং মদীনার অধিবাসী মুসলমানরা মদীনার বাইরে 'বিদা উপত্যকা' পর্যন্ত বাহিনীটির সাথে সাথে হেঁটে এল।

বিদায়ের প্রাক্কালে মহানবী (সা) মুসলিম বাহিনী যাতে কোন অবস্থাতেই নীতিভ্রষ্ট না হয়, কোন বাড়াবাড়ির আশ্রয় যাতে না নেয়, আল্লাহর উপর ভয় ও ভরসাকেই যাতে সর্বাবস্থায় পাথেয় মনে করে, সে জন্যে বিদায়ী উপদেশ হিসেবে বললেন :

'আমি তোমাদেরকে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলবার উপদেশ দিচ্ছি। প্রত্যেক সহচর মুসলমানের সাথে সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দান করছি। আল্লাহর নামে যুদ্ধযাত্রা কর এবং সিরিয়ায় তোমাদের ও আল্লাহর শত্রুদের মুকাবিলা কর।

তোমরা যে দেশে যাচ্ছ সেখানকার মাঠে সাধু-সন্ন্যাসীদেরকে নিভৃত সাধনায় মগ্ন থাকতে দেখবে। সাবধান! তাদের কাজে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। সাবধান! একটি স্ত্রীলোক, একটি বালক বা বালিকা, একজন বৃদ্ধও যেন কোনক্রমে তোমাদের হাতে নিহত না হয়। সাবধান! শত্রুপক্ষের একটি বৃক্ষও ছেদন করবে না, একটি বাড়ীও নষ্ট করবে না।'

এই প্রথমবারের মত মুসলিমরা আরব ভূখণ্ডের বাইরে যুদ্ধযাত্রা করছে। যাদের বিরুদ্ধে তাদের এই যুদ্ধযাত্রা তারা সংখ্যা ও সজ্জায় অনেক বড়। কিন্তু তবু সৈনিকরা বুঝল, যথেচ্ছা চলার এক ইঞ্চি সুযোগও তাদের থাকল না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাহায্য লাভের এই তো উপায়!

সিরিয়ার আকাশে প্রথম 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি

মুতা যুদ্ধ-যাত্রার একটি মুহূর্ত।

তিন হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী আরব সীমান্ত অতিক্রম করে সিরিয়া প্রদেশে প্রবেশের পর জানতে পারলো, খৃস্টান শাসনকর্তা শুরাহবিল এক লাখ সৈন্যের এক সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার মা'আব স্থানে অপেক্ষা করছেন। মুসলিম বাহিনী আরও জানতে পারলো, রোম সম্রাট স্বয়ং ২ লাখ সৈন্যের একটা বাহিনী তৈরী করছেন শুরাহবিলের সাহায্যের জন্যে। অর্থাৎ গোটা খৃস্টান সাম্রাজ্যই যেন এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

এ খবর পাওয়ার পর মুসলিম বাহিনীর অনেকেই পরিস্থিতি সম্পর্কে পরামর্শ করার প্রয়োজন অনুভব করল।

পরামর্শ সভায় মিলিত হবার জন্যে মুসলিম বাহিনীর যাত্রাবিরতি হলো।

বসল পরামর্শ সভা।

অনেক কথা হলো।

কিছু লোক পরামর্শ দিলেন, 'এই নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে মদীনায় খবর পাঠানো হোক। এ ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর পরামর্শ আসার পর সে অনুসারে কাজ করা উচিত।'

যারা এই মত প্রকাশ করলেন, তারা যুক্তি হিসেবে বললেন, 'তিন হাজার সৈন্য নিয়ে লাখ অথবা তারও বেশী সুসজ্জিত সৈন্যের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত হবে না।'

যুক্তি খুবই শক্তিশালী। বিশেষ করে মহানবী (সা)-এর পরামর্শ নেয়ার প্রস্তাব অনেকের কাছে সঙ্গত বলে মনে হলো।

কিন্তু অনেকেই এই দ্বিধাগ্রস্ততাকে মেনে নিতে পারলেন না। তাদেরই একজন মহামতি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, যাকে মুতা যুদ্ধের তৃতীয় সেনাপতি হিসেবে মহানবী (সা) নিয়োগ দিয়েছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে গুরুগম্ভীর আওয়াজে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'মুসলিম সৈনিকবৃন্দ, তোমরা যে সাফল্য অর্জনের জন্যে বের

হয়েছিলে, আল্লাহর কসম এখন সে সাফল্যই যেন তোমাদের কাছে অবাঞ্ছিত বলে মনে হচ্ছে। তোমরা তো বের হয়েছিলে শাহাদাত হাসিলের উদ্দেশ্যে, সত্যের নামে আত্মোৎসর্গ করার জন্যে। সংখ্যার গণনা মুসলমানরা কখনই করে না, পার্থিব শক্তির তুলনা করার কাজে কখনই তারা প্রবৃত্ত হয় না, তাদের একমাত্র শক্তি আল্লাহ। সেই আল্লাহর প্রেরিত মহাসত্যকে বক্ষে ধারণ করে, সত্যের তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে কর্তব্যের কোরবান গাহে আল্লাহর নামে হৃৎপিণ্ডের শোণিত ঢেলে দেয়াই তো আমাদের সাফল্য। বিজয়ী হতে পারি ভাল, আর শাহাদাত যদি হয় আরও ভাল। সুতরাং এ সময় এত আলোচনা আর এই যুক্তি-পরামর্শ কিসের জন্যে?

রাওয়াহার এই তেজোদীপ্ত কথা প্রতিটি মুসলিম সৈনিকের দেহে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করলো। দুই চারজন যারা দূরদর্শিতা অবলম্বন ও হিসাব-নিকাশের কথা বলছিলেন, তারাও নতুন চেতনায় জেগে উঠলো। সকলে একবাক্যে বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম, রাওয়াহার পুত্র ঠিক বলেছেন।'

তিন সহস্র মুসলিম সৈনিকের কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, 'আল্লাহু আকবার।' সিরিয়ার আকাশে প্রথম উত্থিত এই সম্মিলিত তাকবির ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সিরিয়ার পথ-প্রান্তরে। মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা আবার শুরু হলো।

মুতার যুদ্ধ চলছে।

এক লাখ সুসজ্জিত সৈন্যের বিরুদ্ধে তিন হাজার সৈন্যের লড়াই।

সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারেসার শাহাদাতের পর সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন জাফর ইবনে আবু তালিব। ভয়াবহ যুদ্ধের তীব্রতার মধ্যে সেনাপতি জাফরও শহীদ হলেন। তাঁর শাহাদাতের পর পতাকা তুলে ধরলেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। তিনিও শহীদ হলেন।

মুসলিম পতাকা ভূলুণ্ঠিত হলো রণাঙ্গনে।

পতাকা ভূলুণ্ঠিত হওয়ায় মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্র ভেঙ্গে পড়লো।

মুসলিম বাহিনীর তখন মহাবিপর্যয়কর অবস্থা। একদিকে শত্রুপক্ষের প্রবল চাপ, অন্যদিকে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিহীন বিশৃংখল অবস্থা। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, গোটা যুদ্ধক্ষেত্রে দু'জন মুসলিম সৈনিকও একসাথে ছিলো না। যুদ্ধের এই অবস্থা দেখে কেউ কেউ মদীনা অভিমুখে পালানো শুরু করেছিলেন। ভয়াবহ এই দুঃসময়ে উকবা ইবনে আমের নামক একজন সাহাবী উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'পলাতক অবস্থায় নিহত হওয়া অপেক্ষা সামনে অগ্রসর হয়ে জীবন দেয়া শ্রেয়তর।'

উকবার এই চিৎকারে অনেকের চেতনা হলো, কেন্দ্রও একটা খুঁজে পেলো তারা। কিছু মুসলিম যোদ্ধা ছুটে এলো তাঁর দিকে। সামনেই তাদের মুসলিম বাহিনীর ভূলুণ্ঠিত, পদদলিত পতাকা। সাবেত ইবনে আকরাম নামে একজন মুসলিম সৈনিক বিদ্যুৎবেগে ছুটলেন শত্রুর মরণব্যূহ ভেদ করে পতাকার দিকে।

তুলে ধরলেন তিনি পতাকা এবং সবেগে তা বাতাসে উড়াতে উড়াতে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'কে কোথায় আছ মুসলিম বীর, এদিকে ছুটে এসো'। একজন সেনাপতি নির্বাচন করতে হবে। ছুটে এলো আরও কিছু মুসলিম সৈনিক। সাবেত এবং উপস্থিত অন্যান্য সৈনিকরা সেনাপতি হিসেবে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ-এর নাম প্রস্তাব করলেন।

খালিদ বিনীতিভাবে বললেন, 'সাবেত, তুমি আমাদের সকলের ভক্তিভাজন, তুমিই এর উপযুক্ত পাত্র। তুমিই আমাদের সেনাপতি।'

কিন্তু দূরদর্শী সাবেত তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'খালিদ, ভাবপ্রবণতা ছাড়, কথা কাটাকাটির সময় এটা নয়। আমরা সকলে তোমাকেই সেনাপতি মনোনীত করেছি। মহানবী (সা):এর পতাকা তুমি গ্রহণ করো এবং বলো আমাদের কি করতে হবে।'

খালিদ আর অপেক্ষা করলেন না। ভক্তিভরে মহানবীর যুদ্ধ-পতাকা হাতে তুলে নিলেন।

মুতার যুদ্ধ নিয়ে উদ্বিগ্ন মহানবী (সা)।

মুতায় সৈন্যদল পাঠাবার কয়েকদিন পর যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে আবু আমের আশআরী নামক একজন সাহাবীকে তিনি পাঠালেন মুতা অঞ্চলে।

তিন সেনাপতি শহীদ হওয়ার মর্মান্তিক খবর পেয়ে আবু আমের ছুটে এলেন মদীনায়। বললেন মহানবীকে, তিন সেনাপতি শহীদ হওয়ার পর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এখন সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

শহীদ তিন সেনাপতির মধ্যে জাফর ছিলেন মহানবী (সা)-এর চাচাতো ভাই। শহীদের আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দিয়ে মহানবী (সা) জনসমক্ষে এসে দাঁড়ালেন। বললেন সকলকে উদ্দেশ্য করে, 'সকলে যুদ্ধ যাত্রা কর, ভাইদের সাহায্য কর। একজন সমর্থ ব্যক্তিও যেন বাদ না পড়ে।'

যে যুদ্ধে যায়েদ, জাফর, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মত বীর সেনাপতি পর পর শহীদ হন সে যুদ্ধ যে কতটা ভয়াবহ তা বুঝতে মদীনার কারোরই বাকী রইল না। তার উপর মহানবীর আহ্বান পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। অভূতপূর্ব এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো মদীনায়।

সাহাবীরা যে যে অবস্থায় ছিল, যে যা পেল তা নিয়ে ছুটলো মুতার দিকে। কেউ হেঁটে কেউ ঘোড়ায় বা উটে চড়ে। এই যুদ্ধ-যাত্রার ক্ষেত্রে কেউ কারও অপেক্ষা করেনি। কে কার আগে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছতে পারে তারই যেন প্রতিযোগিতা। মহানবী (সা), হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)–একইভাবে মুতা যাত্রা করলেন।

মদীনা থেকে প্রেরিত এই সাহায্যের কি পরিমাণ যথাসময়ে মুতা যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের মুসলিম সেনাদলে শামিল হতে পেরেছিলেন, এটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো মদীনা থেকে সাহায্য পৌঁছেছিল। খৃস্টান শুরাহবিলের বাহিনীর জন্যে এটা ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক ধরনের বড় খবর।

সেদিন রাত শেষে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ মুতা প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীকে এমন

কৌশলে ছকে ছকে দাঁড় করালেন যাতে মনে হতে লাগল মদীনা থেকে অসংখ্য সৈন্য মুতায় পুরাতন সেনাদলের সাথে যোগ দিয়েছে।

খৃস্টান বাহিনীকে স্তম্ভিত করল এই ঘটনা।

আর সেদিন মুসলিম বাহিনীও এমনভাবে যুদ্ধ শুরু করল যেন তারা শতগুণ শক্তিতে আজ উদ্দীপ্ত।

ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংঘটিত হলো সেদিনও। অবশেষে খৃস্টান বাহিনী পিছু হটল। সেদিন প্রথমে তাদের মানসিক পরাজয় সূচিত হয়েছিল। সেই মানসিক পরাজয় ডেকে আনল যুদ্ধে তাদের এক শোচনীয় পরাভব।

মুতার যুদ্ধ চলেছিল প্রায় ৭ দিন ধরে। এক খালিদ ইবনে ওয়ালিদের হাতেই ৮টি তরবারি টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে তিনি ব্যবহার করেছিলেন নবম তরবারী।

মুতা ছিল তদানীন্তন আরব এলাকার বাইরে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ এবং প্রথম বিজয়।

হুদায়বিয়া সন্ধির পর দেশের ভেতরে-বাইরে ইসলামের দ্রুত বিস্তারে দিশেহারা হয়ে পড়ল কুরাইশ এবং আরবের প্রধান পৌত্তলিক গোত্রগুলো।

মক্কার কুরাইশ, তায়েফের সাকিফ এবং হোনায়েনের হাওয়াজেন ছিল আরবের প্রধান পৌত্তলিক গোত্র। তারা একযোগে চেষ্টা করে সমগ্র দক্ষিণ আরবের সব পৌত্তলিক গোত্রকে সংঘবদ্ধ করল মহানবীর মদীনার উপর শেষ আঘাত হানার জন্যে।

অসুবিধাটা হয়ে দাঁড়াল মক্কার পার্শ্ববর্তী খোজাআ গোত্র। গোত্রটি মুসলমানদের মিত্র এবং আশ্রিত। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে একটা শর্ত ছিল যে আরবের অন্যান্য গোত্র তাদের ইচ্ছা অনুসারে কুরাইশ অথবা মুসলমান যে কোন পক্ষের মিত্র হতে পারে। সেই অনুসারে খোজাআর চিরশত্রু বনি বকর কুরাইশদের সাথে যোগ দিলে বনি খোজাআ মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে। তাছাড়া এই খোজাআ পূর্ব থেকে বরাবরই মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।

কুরাইশ, হাওয়াজেন ও সাকিফ গোত্রত্রয় পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল, মুখের সামনে থেকে খোজাআদের সরাতে হবে, নির্মূল করতে হবে। এতে হবে দুইটা কাজ। এক, গোটা দক্ষিণ আরব একমুখী হবে এবং হুদায়বিয়া সন্ধি ভঙ্গ হওয়ার ফলে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের সুযোগ পাওয়া যাবে।

বনি খোজাআদের প্রতিবেশী এবং চিরশত্রু বনি বকর গোত্রকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করল কুরাইশরা এবং উত্তেজিত করে তুলল তাদেরকে খোজাআদের বিরুদ্ধে।

একদিন রাতে ঘুমন্ত খোজাআ গোত্রের উপর আপতিত হলো বনি বকরের লোকরা। তাদের সাহায্য করতে এল কুরাইশদেরও কিছু লোক।

সেদিন রাতে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হলো খোজাআ পল্লীতে। বাঁচার জন্যে কিছু পুরুষ-নারী-শিশু আশ্রয় নিয়েছিল কা'বা ঘরে, যেখানে সকল মানুষ অবধ্য। কিন্তু কা'বায় আশ্রয় নিয়েও বাঁচল না তারা। আক্রমণকারীদের একজন চিৎকার করে বলল, আজ আর ঈশ্বর বলে কেউ নেই, আজ মনের সাধ মিটিয়ে শত্রু বিনাশ কর।

বনি খোজাআর এই মর্মান্তিক খবর মদীনায় গিয়ে পৌঁছল। শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন মহানবী। একদিকে খোজাআদের হত্যাকাণ্ড, অন্যদিকে কুরাইশদের জঘন্য অপরাধ দুই-ই তাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল। খোজাআরা তার মিত্র, আশ্রিত আর কুরাইশরা তার স্বজন।

কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন মহানবী (সা)। কুরাইশদেরকে তাদের সন্ধি ভঙ্গ ও হত্যাকাণ্ডের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

তিনি কুরাইশদেরকে একটা সুযোগ দেয়ার জন্য দূত পাঠালেন মক্কায়। তিনি বলে পাঠালেন, অর্থ দ্বারা অন্যায় হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ করতে হবে, অথবা বনি বকর গোত্রের সাথে মিত্রতা পরিত্যাগ করতে হবে। কোন একটিকে তাঁদের গ্রহণ করতে হবে।

কুরাইশরা সন্ধি ভঙ্গই চাচ্ছিলো। সুতরাং মহানবীর শর্ত পাবার সাথে সাথেই তারা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভেঙ্গে গেছে বলে ঘোষণা দিলো।

কুরাইশদের আচরণ মহানবী (সা)-কে খুবই ব্যথিত করলো। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মক্কা অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন।

সন্ধি বাতিল করার পর কুরাইশরা বুঝতে পারলো ঝোঁকের মাথায় তারা যে কাজ করেছে, তা ঠিক হয়নি। স্বয়ং আবু সুফিয়ান ছুটলেন মদীনায় বুঝিয়ে মহানবীকে নিবৃত্ত করার জন্যে। আবু সুফিয়ান আবু বকর (রা), উমর (রা), আলী (রা) সহ সকলের দ্বারস্থ হলেন সুপারিশ করার জন্য যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি ঠিক আছে, ভেঙ্গে যায়নি। কিন্তু মহানবী কোন কথার প্রতিই কর্ণপাত করলেন না। স্বজনের চেয়ে চুক্তি বড়, ওয়াদা বড়, খোজাআদের প্রতি কৃত অন্যায়ের অবশ্যই প্রতিবিধান করতে হবে।

৮ম হিজরী ১৮ই রমযান দশ হাজার মুসলিম মুজাহিদ নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করলেন মহানবী (সা)।

'ফাতহুম মুবিন' বা মক্কা বিজয়ের মহামুহূর্তটি সমাগত।

দশ হাজার মুসলিম সৈন্যের বাহিনী সেদিন গভীর রাতে মক্কার উপকণ্ঠ মাররুজ্-জাহরান উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছল এবং সেখানেই রাত যাপনের সিদ্ধান্ত নিলো।

মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ও আরও কয়েকজন রাতে মক্কার চারদিকটা পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছিল। তারা জানতো না মুসলিম বাহিনী মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে। মাররুজ্-জাহরান উপত্যকায় হাজার হাজার আলোর সারি দেখে স্তম্ভিত হলো আবু সুফিয়ান।

রহস্য উদ্ধারের জন্যে আবু সুফিয়ান অতি সন্তর্পণে এগুলো ঐ উপত্যকার দিকে।

হঠাৎ আবু সুফিয়ান বন্দী হয়ে গেলো হযরত উমর (রা)-এর হাতে। হযরত উমর (রা) আরও কয়েকজনকে সাথে নিয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী দিকটা।

হযরত উমর (রা) আবু সুফিয়ানকে মহানবীর সামনে হাজির করে বললেন, সত্যের শত্রুদের সমূলে উৎপাটিত করার শুভমুহূর্ত সমাগত। আবু সুফিয়ান বন্দী। প্রতিশোধ গ্রহণ ও প্রতিফল দানের সময় উপস্থিত।

মহানবী (সা) এ প্রসঙ্গে না গিয়ে আবু সুফিয়ানকে সম্বোধন করে বললেন, আবু সুফিয়ান, এখনও তুমি সেই করুণা-নিধান 'ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু' কে চিনতে পারোনি?

আবু সুফিয়ান বিমর্ষভাবে আমতা আমতা করে বললো, 'তা, এখন পারছি বৈ কি। আমাদের ঠাকুর কেউ থাকলে আমাদের পানে তাকাতো।'

আবু সুফিয়ানের উত্তরে উৎসাহিত হয়ে মহানবী (সা) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা আবু সুফিয়ান, আমি যে আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবী, এ ব্যাপারে এখনও কি তোমার সন্দেহ আছে?'

আবু সুফিয়ান বললো, 'এখনও কিছু কিছু সন্দেহ আছে?'

মহানবী (সা) বন্দী আবু সুফিয়ানের কথায় বিন্দুমাত্রও ক্রুদ্ধ হলেন না এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও গ্রহণ করলেন না।

শুধুমাত্র মহানবী (সা) আবু সুফিয়ান যখন ফিরে যাবার জন্যে উদ্যত হলেন, তখন তাকে আদেশ করলেন সকাল পর্যন্ত থেকে যেতে। মহানবী (সা) বোধ হয় চেয়েছিলেন আবু সুফিয়ান ফিরে গিয়ে গোঁট পাকাবার কোন সুযোগ না পাক।

সেনাপতি সা'আদ পদচ্যুত হলেন

মক্কার উপকণ্ঠে মাররুজ্ জাহরান উপত্যকায় ফজরের নামায পড়ে দশ হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী মক্কা প্রবেশের জন্যে যাত্রা শুরু করলেন।

বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে দলে দলে বিভক্ত হয়ে মুসলিম বাহিনী মক্কা প্রবেশের জন্যে অগ্রসর হচ্ছে।

প্রত্যেক সেনাপতি বহন করছেন তাঁর দলের পতাকা।

তখনও সকাল হয়নি। আবু সুফিয়ান মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর সাথে এক টিলায় বসে তাদের সম্মুখ দিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসরমান মুসলিম সেনাদলের শান-শওকত ও শৃংখলা দেখছিলেন বিস্মিত চোখে।

মদীনার আনসার রেজিমেন্ট তখন অগ্রসর হচ্ছিল আবু সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে।

আবু সুফিয়ান চিনতে পারলো না ওদের। জিজ্ঞাসা করল হযরত আব্বাস (রা)-কে, এরা কারা?

আব্বাস (রা) বললেন, এটা মদীনার আনসারদের রেজিমেন্ট। সা'আদ ইবনে উবাদা এদের সেনাপতি।

তখন সেনাপতি সা'আদ ইবনে উবাদা একদম সামনে এসে পড়েছিলেন। তিনি আবু সুফিয়ানকে দেখে বললেন, 'আজ ভীষণ সংঘর্ষের দিন, আজ কা'বার সম্ভ্রম বিনষ্ট হবে।'

শুনে তাঁর জাতির কথা ভেবে আবু সুফিয়ান আর্তনাদ করে উঠলেন। অনুরোধ করতে লাগলেন তিনি হযরত আব্বাসকে কুরাইশদের সাহায্য করার জন্যে।

আনসারদের পরেই ছিল মুহাজির রেজিমেন্ট। আবু সুফিয়ান দেখলেন, মুহাজির দল যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে এবং মহানবী (সা) তাদের সাথে রয়েছেন।

দেখেই আবু সুফিয়ান ছুটলেন মহানবীর কাছে। আর্তনাদ করে বললেন, "মুহাম্মাদ, তুমি কি তোমার স্বজনদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছ?"

মহানবী (সা) বললেন, 'না, কখনই না।'

তখন আবু সুফিয়ান সা'আদ ইবনে উবাদার কাছে যা শুনেছিল, বলল মহানবীকে।

শুনে মহানবী বললেন, 'না, সা'আদের কথা সত্য নয়, আজ প্রেম ও করুণার দিন। আজ কা'বার সম্ভ্রম চির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন।'

বলে একজন অশ্বারোহীকে কিছু নির্দেশ দিলেন মহানবী (সা)।

সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বারোহীটি ছুটল আনসার রেজিমেন্টের দিকে। সে সেনাপতি সা'আদ ইবনে উবাদার সামনে হাজির হয়ে জানাল যে, আবু সুফিয়ানকে উপরোক্ত উক্তি করার জন্যে তাকে পদচ্যুত করা হয়েছে।

সেনাপতি সা'আদ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হাতের পতাকা নব নিয়োজিত সেনাপতির হাতে তুলে দিয়ে পেছনে সাধারণ সৈনিকদের কাতারে এসে দাঁড়ালেন। কোন প্রশ্ন বা অসন্তুষ্টির সামান্য চিহ্নও তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠল না।

অশ্বারোহীকে আনসার রেজিমেন্টের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে মহানবী (সা) আবু সুফিয়ানকে বললেন, 'আবু সুফিয়ান, গিয়ে মক্কাবাসীকে অভয় দাও, আজ তাদের প্রতি কোনই কঠোরতা দেখানো হবে না। তুমি আমার পক্ষ থেকে ঘোষণা করে দাও :

(ক) যে ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করবে তাকে অভয় দেয়া হলো।

(খ) যে ব্যক্তি কা'বায় প্রবেশ করবে, তারা নিরাপদ।

(গ) যারা দরজা বন্ধ করে বাড়ীর ভেতরে অবস্থান করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং

(ঘ) যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, তারাও নিরাপদ।

মক্কাবাসীকে অভয়দানের এই চারটি শর্তের ঘোষণা মুসলিম বাহিনীর সব সৈন্য, সব সেনাপতিকে জানিয়ে দেয়া হলো। সেই সাথে মুসলিম বাহিনীকে আদেশ দেয়া হলো, মক্কায় প্রবেশের সময় বা পরে কেউই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না।

যারা বার বার মদীনায় অভিযান পরিচালনা করেছে মুসলমানদের অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে মুছে ফেলার জন্যে, মদীনাকেও ধ্বংস করার জন্যে, তাদের জন্যেই মহানবীর এই ক্ষমা, এই মহানুভবতা। কারণ তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন।

আরব উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলে পারস্য উপসাগরের পানির উপর দাঁড়ানো বাহরাইন।

বাহরাইনের শাসক তখন মানজার ইবনে ছাভী।

ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মহানবী (সা)-এর একটা চিঠি তাঁর কাছে পৌছল।

ইসলামের উত্থান ও এর গতিধারা সম্পর্কে আগে থেকেই খবর রাখছিলেন তিনি। ইয়ামেনের শাসনকর্তা 'বাজান'-এর খবরও তাঁর কাছে ছিল। পারস্য সম্রাট মহানবী (সা)-কে ধরতে পাঠিয়ে নিজেই ধরাধাম থেকে বিদায় নিলেন, তাও তিনি জানতেন।

মহানবীর চিঠি পেয়ে মানজার সঙ্গে সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। বাহরাইনের আরব বাসিন্দারাও তাঁর সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলো।

কিন্তু রাজ্যের ইহুদী ও অগ্নিপূজকরা ইসলাম গ্রহণ করলো না।

বাহরাইনের শাসক মানজার ইবনে ছাভী একে ভালোভাবে নিলেন না। শাসক যাকে ভালো মনে করলেন, প্রজা তাকে ভালো মনে করলো না। এটা সেই যুগের শাসকদের হজম করা কঠিন ছিল। মানজারও কিছু প্রজার এই ঔদ্ধত্য হজম করতে পারলেন না। তবে মহানবীর হুকুম ছাড়া কিছু না করার সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ লাভের জন্যে মানজার লিখলেন মহানবীর (সা) কাছে।

মানজারের সিদ্ধান্ত এবং মহানবীর কাছে তাঁর লিখার বিষয়টা ইহুদী ও অগ্নিপূজকরা জানতে পারলো। তারা উদ্বিগ্ন হলো তাদের ভবিষ্যত নিয়ে।

যথাসময়ে মহানবী (সা)-এর চিঠি এলো মানজারের কাছে। অত্যন্ত আদবের সাথে চিঠি খুলে পড়তে লাগলেন তিনি

"ধর্ম সম্বন্ধে কোন জোর-জবরদস্তি করা অধর্ম। যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করে, সে

তো কেবল নিজেরই কল্যাণ সাধন করে থাকে। যারা ইহুদী বা পারসিক ধর্মে থাকতে চায়, তাদেরকে যিজিয়া দিতে হবে মাত্র। এর অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ে তাদের উপর তোমার আর কোন অধিকার থাকবে না।"

চিঠি পড়ে মহানবী (সা)-এর দয়া ও মহানুভবতায় কেঁদে ফেললেন মানজার। কত বড় দয়ার সাগর তিনি? বিধর্মী প্রজাদের পক্ষ হয়ে মানজারকেই তিনি শাসন করেছেন।

এই খবর ইহুদী এবং অগ্নিপূজক প্রজাদেরকেও অভিভূত করলো। এতদিন তারা পারস্য সম্রাট ও তাদের কর্মচারীদের অমানুষিক অত্যাচারে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এক যিজিয়ার বিনিময়ে সব কর ও যুলুম থেকে রেহাই পেয়ে তারা মহানবী (সা)-এর নামে সকলে জয়ধ্বনি করতে লাগলো। ইসলাম গ্রহণের হার তাদের মধ্যে দ্রুত বেড়ে চললো।

রাহমাতুল্লিল আলামীন মহানবী (সা) রক্তপাত চান না। মক্কা প্রবেশেও তিনি রক্তপাত এড়াতে চাইলেন।

এ লক্ষ্যেই তিনি একটা পাহাড়ের শীর্ষে বসে চারদিকে নজর রাখলেন কোথায় কি ঘটে তা দেখার জন্যে।

হঠাৎ মক্কার এক উপত্যকা-পথে সকালের রোদে উত্তোলিত তরবারির ঝিলিক দেখতে পেলেন মহানবী (সা)। ঐ উপত্যকা পথে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর একটা দল মক্কায় প্রবেশ করছে। মহানবী (সা) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খালিদকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন কৈফিয়ত দেয়ার জন্যে।

খালিদ হাজির হলেন। নিবেদন করলেন বিনীতিভাবে, 'আমি আপনার আদেশ পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কুরাইশদের দলটাকে কোনোভাবেই নিরস্ত্র করা যায়নি। তারা আমাদেরকে আক্রমণ করে এবং দু'জন মুসলিম সৈন্যকে হত্যা করে। তখন বাধ্য হয়ে আমাদেরকেও অস্ত্র বের করতে হয়।'

এই সময় মহানবী (সা) আরও খবর পেলেন, কুরাইশ-প্রধানরা পরামর্শ করে কুরাইশ ও অন্যান্য অনুগত গোত্রের দুর্দান্ত ও গুণ্ডা শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোকদের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ঠিক হয় যে, তারা সুবিধা করতে পারলে সবাই একযোগে মুসলমানদের আক্রমণ করবে। আর যদি তারা ব্যর্থ হয়, তাহলে যে অভয় তারা মহান্‌বীর কাছ থেকে পেয়েছে, তার অধীনে তারা আত্মরক্ষা করবে।

কুরাইশদের অকারণ সৈন্য সমাবেশের মধ্যেও মহানবী এরই প্রমাণ পেলেন। কুরাইশদের এই ষড়যন্ত্র টের পেয়ে মহানবী (সা) আনসার রেজিমেন্টকে সতর্ক থাকতে এবং সকালে ছাফা পর্বতের পাদমূলে সমবেত হতে আদেশ দিলেন।

মহানবী (সা) দেখাতে চাইলেন মুসলমানরা প্রস্তুত আছে, অতএব কুরাইশদের কোন ষড়যন্ত্র কাজে আসবে না।

কুরাইশরাও শীঘ্র এটা বুঝতে পারলো এবং ষড়যন্ত্র বাদ দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যত ভেবে ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

আবু সুফিয়ান আবার ছুটলো মহানবীর (সা) কাছে। আর্তনাদ করে আবার সেই আগের মতই বলল, 'মুহাম্মাদ, কুরাইশদের এই দলকে তুমি যদি ধ্বংস কর, তাহলে আজ থেকে কুরাইশদের নাম-নিশানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।'

কুরাইশরা সর্বশেষেও যে অপরাধ করলো তাতেও মহানবী (সা) তাদের জন্যে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু মহানবী (সা) তো এসেছেন মানুষকে মানুষ বানাবার জন্যে, তাদের শাস্তি দেবার জন্য নয়।

মহানবী (সা) আবু সুফিয়ানকে বললেন, যাও, আবার অভয় দিলাম, তোমাদের পুনরায় ক্ষমা করলাম। যা বলেছিলাম সেই অনুসারে কাজ কর গিয়ে।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা) মক্কাবাসীর জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন।

এরপরও কিছু পাষণ্ড প্রকৃতির মানুষ মহানবী (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটলো।

এমনই এক মদ্যপ ও পাষণ্ড ছিল ফুজালা ইবনে উসার। অপরাধীদের আড্ডাখানা, মদের দোকান আর বেশ্যালয়ই ছিল তার স্থান।

জাত-অপরাধী ফুজালা মহানবী (সা)-কে হত্যা করার জন্যে কা'বায় পৌঁছে দেখলো, মহানবী (সা) নিবিষ্ট মনে তাওয়াফ করছেন, আল্লাহ্‌র ধ্যান ছাড়া কোনদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই।

ফুজালা একে তার জন্যে এক মহাসুযোগ বলে মনে করলো।

অস্ত্রটা কাপড়ের আড়ালে রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণে মহানবীর (সা) দিকে এগুলো ফুজালা।

ফুজালা তখন মহানবীর একেবারে কাছে পৌঁছে গেছে।

মহানবী (সা) ফুজালার দিকে তাকালেন।

বললেন, 'কে, ফুজালা নাকি?'

মহানবী (সা) বললেন, 'কি মতলব আঁটছো?'

অন্তরটা কেঁপে উঠলো ফুজালার। বললো সে, 'জ্বি, কিছু না। এই আল্লাহ আল্লাহ করছি।'

মহানবী (সা) ফুজালার চোর ধরা পড়ার মতো দুর্দশাকর অবস্থা দেখে হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না। মধুর হেসে তিনি বললেন, 'বেশ কথা, ফুজালা। সেই আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।'

ফুজালা বুঝলো তার গোপন অভিসন্ধি মহানবীর কাছে ধরা পড়ে গেছে।

ফুজালার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। ভয়, লজ্জা, অনুতাপে অভিভূত ও বিমূঢ় হয়ে পড়লো সে।

বুকের ভেতর তখন তার অসহ্য তোলপাড়।

বিমূঢ়, নিশ্চল ফুজালার বুকে মহানবী (সা) তাঁর ডান হাত রাখলেন।

ফুজালা স্বয়ং বলেছেন, 'মহানবীর হাতের স্পর্শ পাওয়ার সাথে সাথে আমার মনের সমস্ত চাঞ্চল্য ও সকল অশান্তি দূর হয়ে গেলো। আমি এক স্বর্গীয় শান্তি ও অনির্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করলাম।' ফুজালা হয়ে গেলেন নতুন মানুষ।

মহানবীর স্পর্শে ধন্য পবিত্র দেহ ও শুদ্ধ হৃদয় নিয়ে ফুজালা ছুটলেন তার বাড়ীর দিকে।

পথে দেখা হলো ফুজালার বড় আদরের, বড় গৌরবের রক্ষিতা-সুন্দরীর সাথে।

রক্ষিতা সুন্দরী বললো, 'প্রাণেশ্বর ফুজালা, এভাবে কোথায় ছুটছো? এসো আমার কাছে!'

ফুজালা মুহূর্তের জন্যে না দাঁড়িয়ে রক্ষিতার দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগলেন, 'একমাত্র আল্লাহই আমাদের প্রাণের মালিক, তাকেই প্রেম করো, শান্তি পাবে। আর নয়, আল্লাহ্ ও ইসলাম আমাকে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।'

মক্কার আবু জাহ্‌ল ইসলামের প্রধানতম বৈরী ছিলো। বদর যুদ্ধে সে নিহত না হওয়া পর্যন্ত মহানবী (সা) ও ইসলামের বিরুদ্ধে অবিরাম শত্রুতা করে গেছে। আবু জাহ্‌লের পুত্র ইকরামাও তার পিতার মতই ইসলামের বৈরী ছিলো। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এমন কি মহানবী (সা)-এর মক্কা প্রবেশের সময় যখন কুরাইশদের অস্ত্র হাতে না নেয়ার কথা, তখন ইকরামার নেতৃত্বেই কুরাইশদের একটা দল হত্যা করে দু'জন মুসলিম সৈনিককে।

সেই ইকরামা মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মক্কা বিজয়ের পর তখনও মহানবী (সা) মক্কায়। একদিন ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল মহানবীর কাছে এলেন। বললেন অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, মুসলমানরা আমার পিতাকে গালাগালি দিয়ে থাকে।'

খবরটা মহানবী (সা)-কে খুবই বেদনা দিল। তিনি মুসলমানদের এক সমাবেশে সকলকে সম্বোধন করে বললেন, মৃতদের গালাগালি দিয়ে জীবিতদের যন্ত্রণা দিও না। মৃতরা তাদের কর্মফল নিয়ে চলে গেছে। তাদের গালি দেয়া অনুচিত। উচিত মৃত ব্যক্তিদের জীবনের মন্দ দিকটা বাদ দিয়ে কেবল তাদের ভাল দিকটা আলোচনা করা।

ইসলামের এই সভ্যতা, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে ইসলামের এই মানবতা এবং ইসলামের এই সৌন্দর্যই মানুষের হৃদয় জয়ের মাধ্যমে বিশ্বজয় করেছিল।

মক্কা নগরী মুক্ত হয়েছে।
কা'বাঘরকে মূর্তির ও পূজার হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে।
মুসলমানরা মুক্ত আল্লাহর ঘর কা'বায় প্রাণভরে একদিন একরাত তাওয়াফ করেছে।
কিন্তু নামায তখনও হয়নি, আযান তখনও উত্থিত হয়নি কা'বায় মক্কার আকাশে।
মক্কা জয়ের পর দ্বিতীয় দিন নামাযের সময় হলে মহানবী (সা) বেলালকে আযান দিতে বললেন।
আদেশমাত্র বেলাল কা'বার একটি উচ্চস্থানে উঠে আযান দিতে শুরু করলেন।
কত শতাব্দী পর কে জানে মক্কায় এই প্রথম আযান। মক্কার আকাশে-বাতাসে, প্রতিটি পাহাড় এবং পাথরে পাথরে সে আযান প্রতিধ্বনিত হলো। অভূতপূর্ব আবেগে শিহরিত মুসলমানদের প্রতিটি কণ্ঠ বেলালের প্রথম তাকবির ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই একযোগে তাকবির দিয়ে উঠলো।
বেলালের আযান এবং সম্মিলিত তাকবির ধ্বনি কিয়ামতকাল পর্যন্ত এক নতুন পৃথিবীর আগমনি সঙ্গীত হিসেবে যেন প্রতিভাত হলো।
স্বাধীন মক্কায় প্রথম নামায অনুষ্ঠিত হলো।
নামায শেষ হয়েছে।
মহানবী (সা) উঠে দাঁড়ালেন।
সারিবদ্ধ মুসলমানরা বসে। তাদের সকলের চোখ মহানবীর মুখে নিবদ্ধ।
কুরাইশদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে সমবেত হয়েছে মহানবী (সা) কি ঘোষণা দেন তা শোনার জন্যে। মহানবী (সা) যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন, এখন যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে পরাজিত মক্কাবাসীদের জন্যে কি ব্যবস্থা তিনি দেন তা শোনার জন্যে তারা উদগ্রীব। তাদের সকলেরই অন্তর কাঁপছে অজানা সব আশংকায়। মক্কার জীবনে মহানবীকে এমন কষ্ট নেই যা তারা দেয়নি। তারপর মদীনা গেলে সেখানেও মক্কাবাসীরা একের পর অভিযান পাঠিয়েছে মহানবীসহ মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যে। সেই মহানবী আজ বিজয়ী। মক্কাবাসীদের সম্পর্কে তিনি কি ব্যবস্থা নেবেন?
মহানবী তাঁর ভাষণ শুরু করলেন।
জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন তিনি :
"আল্লাহ্র শোকর, যিনি নিজের ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, যিনি নিজের দাসকে সাহায্য করেছেন এবং একাকী শত্রুদের যিনি পরাভূত করেছেন"।

(১) "সকলে শ্রবণ কর! অন্ধকার যুগের সমস্ত অহংকার– তা অর্থগত হোক আর শোণিতগত হোক– সমস্তই আমার এই যুগল পদতলে দলিত, মথিত ও চিরকালের তরে রহিত হয়ে গেল।

(২) অতঃপর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তাহলে সেটা তার ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং সে জন্য তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। ভ্রমজনিত নরহত্যার জন্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে একশত উষ্ট্র ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা হলো। এটাও তার ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য হবে।

(৩) 'হে কুরাইশ জাতি! মূর্খতা যুগের অহমিকা এবং কৌলিন্যের গর্ব আল্লাহ আমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। মানুষ সমস্তই আদম হতে আর আদম মাটি হতে তৈরী হয়েছে।' সকলে শ্রবণ কর, আল্লাহ্ বলছেন : 'হে মানব! আমি তোমাদের সকলকেই (একই উপকরণে) স্ত্রী-পুরুষ হতে সমুৎপন্ন করেছি এবং তোমাদেরকে একমাত্র এই জন্য বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন গোত্রে (বিভক্ত) করেছি যে, তা দ্বারা তোমরা পরস্পরের নিকট পরিচিত হতে পারবে (অহংকার ও অত্যাচার করার জন্য নয়)। নিশ্চয় জেনো যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক সংযমশীল (পরহেযগার), আল্লাহর নিকট সে-ই অধিক মহৎ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী।'

সকল মানুষই আদম হতে পয়দা হয়েছে। সুতরাং আদমের সন্তানগণ পরস্পর পরস্পরের ভাই এবং তারা সকলেই সমান। এরপর এও বলে দেয়া হচ্ছে যে, আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। সুতরাং মানুষকেও মাটির মত সর্বসহ, সর্বপালক ও অহংকারশূন্য হওয়া চাই।

(৪) 'সকল প্রকার মদ ও মাদক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, মুসলমান-অমুসলমান সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ।'

এই সাধারণ ঘোষণা দেয়ার পর মহানবী (সা) কুরাইশদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সাধারণভাবে তাদের সকলকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে কুরাইশ জাতি, হে মক্কার অধিবাসীবৃন্দ! তোমাদের প্রতি কেমন ব্যবহার করবো বলে মনে করছো?'

মহানবী (সা) থামতেই সমাবেশের চারদিক থেকে শতকণ্ঠে উচ্চারিত হলো "আমরা কল্যাণের আশা করছি। হে আমাদের মহিমাময় ভ্রাতা, হে আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি আজ বিজয়ী। তুমি আজ দণ্ডদানে সমর্থ। যদিও আমরা অপরাধ তবু তোমার কাছে সদয় ব্যবহার পাবার প্রত্যাশী।"

তাদের কণ্ঠ থামলে মহানবী (সা) গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আজ তোমাদের প্রতি কোনই অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন, তিনি দয়াময়। তোমরা সকলে মুক্ত, সকলে স্বাধীন।"

মক্কার আশে-পাশের অনেক বেদুইন গোত্র আগে থেকেই কুরাইশদের বাড়াবাড়ির কারণে তাদের উপর বিক্ষুব্ধ ছিল এবং সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল মুসলমানদের প্রতি। মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে কুরাইশদের দর্প চূর্ণ হবার পর এই বেদুইন গোত্রগুলো ইসলামের আরও কাছাকাছি হয়ে পড়েছিল।

মক্কা বিজয় পরবর্তী তাৎক্ষণিক কাজগুলো সম্পন্ন হবার পর মহানবী (সা) তার সাহাবীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পাঠালেন বেদুইন গোত্রগুলোর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবার জন্যে। অস্ত্র ব্যবহার ও যুদ্ধ করার অনুমতি এই দলগুলোর প্রতি ছিল না।

হঠাৎ মহানবী (সা)-এর কাছে খবর এল যে, বনি যাজিমা গোত্রের কয়েকজনকে খালিদ বিন ওয়ালিদের দল হত্যা করে ফেলেছে।

এই খবর শোনামাত্র মহানবী (সা) ব্যাকুলভাবে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি জান, খালিদের এই কাজের সাথে আমার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই।'

সংগে সংগেই মহানবী (সা) বিষয়টার তদন্ত করলেন। তদন্তে পরিষ্কার হলো যে, আবদুল্লাহ ইবনে হুজাইফার বলার দোষে হোক, অথবা নিজের শুনার ভুলের কারণে হোক, খালিদ একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ঐ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন।

বনি যাজিমার লোকরাও জেনে আনন্দিত হলো যে, খালিদের কাজের সাথে মহানবীর (সা) কোন প্রকার সম্বন্ধ বা সহানুভূতি নেই। তারা আরও বুঝতে পারলো যে, খালিদ ভুলক্রমেই যুদ্ধাদেশ প্রদান করেছিলেন।

এসব জেনে বনি যাজিমার লোকরা আশ্বস্ত হলো এবং তাদের মনের বিরূপতাও মিটে গেল।

ওদিকে তদন্ত শেষে মহানবী (সা) হযরত আলী (রা)-কে প্রচুর অর্থসহ বনি যাজিমার কাছে প্রেরণ করলেন তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্যে।

বনি যাজিমার লোকেরা দারুণ বিস্মিত হলো ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্যে হযরত আলীকে আসতে দেখে। যেহেতু হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত নয়, ভুলক্রমে তা সংঘটিত হয়েছে, তাই ক্ষতিপূরণ নেবার কোন চিন্তাও তাদের মনে উদয় হয়নি।

হযরত আলী (রা) মহানবী (সা)-এর প্রতিনিধি হিসেবে বনি যাজিমার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করলেন। নিয়ম অনুযায়ী রক্তপণ বাবদ যে অর্থ বনি যাজিমা'র প্রাপ্য হতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী অর্থ হযরত আলী তাদের দিলেন।

বনি যাজিমা'র কাছে এ এক অকল্পনীয় দৃশ্য, অভাবনীয় এক ঘটনা। যারা আজ বিজয়ী সেই শক্তি তাদের মত এক ক্ষুদ্র গোত্রের কাছে অপরাধ না হওয়া সত্ত্বেও অপরাধ স্বীকার করে এভাবে তার ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে।

বনি যাজিমা পল্লীতে তখন জয়-জয়কার পড়ে গেল মহানবী (সা) এবং ইসলামের নামে।

ওদিকে মহানবীর কাছে হযরত আলী যখন ফিরে গেলেন ক্ষতিপূরণ শেষে এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওদের যা প্রাপ্য তার চেয়ে ওদের বেশী দিয়ে ফেলেছি। মহানবী আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, 'ভাল করেছ, বেশ করেছ।'

তারপর মহানবী (সা) তার দুই হাত উপরে তুলে উচ্চকণ্ঠে আবার বললেন, 'আল্লাহ, তুমি জান। খালিদের কাজের সাথে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, আমি নিরপরাধ।'

মহানবীর কণ্ঠস্বরে কেঁপে উঠলেন উসামা

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা) তখনও মক্কায়। এ সময় কুরাইশ গোত্রের একজন সম্মানিতা মহিলা চুরির অপরাধে ধরা পড়ল।

কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত লোকরা তাকে এই অভিযোগ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা যখন দেখল কোনভাবেই তাকে নিরপরাধী প্রমাণের উপায় নেই, তখন তারা একযোগে উসামাকে গিয়ে ধরল।

উসামা হযরতের খুবই প্রিয়পাত্র। সকলেই দেখেছে, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা) উসামাকে নিজ উটে নিজের পাশে বসিয়ে মক্কা প্রবেশ করেছিলেন।

সকলে উসামাকে অনুরোধ করল, 'আপনি নবীর কাছে সুপারিশ করুন যেন স্ত্রী-লোকটিকে বিনাদণ্ডে মুক্তি দেয়া হয়।'

কুরাইশ সরদারদের অনুরোধে উসামা সুপারিশ করতে রাজি হলেন।

খুশী হলো কুরাইশরা। তারা নিশ্চিত যে, এমন প্রিয়জনের অনুরোধের প্রতি নবী কখনই উপেক্ষা প্রদর্শন করতে পারবেন না।

যথাসময়ে উসামা মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং অভিযুক্ত স্ত্রীলোকটির জন্য মহানবীর স্বগোত্রীয় সম্ভ্রান্তদের অনুরোধের কথা জানালেন।

উসামার কথা শুনামাত্র মহানবী (সা)-এর চেহারায় ভাবান্তর দেখা দিল। উসামাকে লক্ষ্য করে গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, 'উসামা, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডের ব্যতিক্রম করার জন্যে আমাকে অনুরোধ করতে এসেছ?'

মহানবী (সা)-এর কথা ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে উসামা কেঁপে উঠলেন। তার ভুল বুঝতে পারলেন উসামা। নিজের অপরাধের কথা ভেবে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন। বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে ক্ষমা করুন।'

মহানবীর বিচার-নীতির আর একটি ঘটনা।

উপরোক্ত ঘটনার পরবর্তি অপরাহ্ন।

মহানবী (সা)-কে ঘিরে অনেক লোক উপস্থিত।

এক সময় মহানবী (সা) তাদেরকে কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন।

প্রথমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসার পর তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমরা নিশ্চিত জেনে রেখ, তোমাদের আগের অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে বিচার-ক্ষেত্রে তাদের নিরপেক্ষতার অভাবের কারণে। তখন বিচারের সময় জাতি-কুল ও ধন-সম্পত্তির তারতম্য অনুসারে অপরাধীদের দণ্ড ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতো। মানী ও ধনীদের অপরাধ উপেক্ষা করা হতো এবং দরিদ্র ও দুর্বলদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো। সকলে জেনে রাখ, এটা ইসলামের আদর্শ নয়, ইসলাম এই পক্ষপাত সহ্য করে না। আল্লাহ্র কসম, আমার কন্যা ফাতিমাও যদি অপরাধে লিপ্ত হতো, তাহলে তাকেও নির্ধারিত দণ্ডদানে আমি একবিন্দুও কুণ্ঠিত হতাম না।"

হুনাইনের যুদ্ধ।

ওহোদ যুদ্ধের মতেই এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতি। ছড়ানো-ছিটানো বিশাল রণাঙ্গনের এক স্থানে মহানবী তাঁর শ্বেত অশ্বের উপর বসে।

মুসলিম পতাকাগুলো ভূলুণ্ঠিত। মুসলিম বাহিনী সম্পূর্ণ বিশৃংখল হয়ে পড়েছে। ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয় হয়েছিল মহানবীর যুদ্ধ-সংক্রান্ত একটা আদেশ থেকে সরে আসার কারণে। আর হুনাইন যুদ্ধে বিপর্যয়ের কারণ কারো কারো মধ্যে সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভরতা এবং মুসলিম সেনাদলের অংশ হিসেবে আসা পৌত্তলিক সৈন্যদল ও সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের অতি উৎসাহ ও অপরিণামদর্শিতা এবং তাদের কারো কারো ষড়যন্ত্রও।

হুনাইন যুদ্ধের দু'টি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। এক. এ যুদ্ধে মুসলিম পক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল বার হাজার, যা তখন পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধের মধ্যে সর্বোচ্চ (বদরে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩, ওহোদ যুদ্ধে এক হাজার এবং খন্দক যুদ্ধে তিন হাজার)। দুই. এই যুদ্ধে প্রায় দুই হাজার পৌত্তলিক সৈন্য মুসলমানদের পক্ষে যোগদান করে।

এ যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল আরবের সুদক্ষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত হাওয়াজিন, সাকিফ এবং তাদের মিত্র গোত্রসমূহের বিশাল বাহিনী।

হুনাইন প্রান্তরে আগে থেকেই হাওয়াজিন ও সাকিফরা সুকৌশলে সৈন্য মোতায়েন করে ওত পেতে ছিল।

মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগে ছিল পৌত্তলিক সৈন্য ও নব্য মুসলমানরা। তাদের উৎসাহ-আস্ফালন যতটা আকাশস্পর্শী ছিল, তার স্থায়িত্ব ততটাই ছিল পাতালস্পর্শী।

অগ্রভাগে থাকার কারণে হাওয়াজিন ও সাকিফদের পরিকল্পিত প্রচণ্ড ও অব্যাহত আক্রমণ তাদের উপর প্রথম আসে। আক্রান্ত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তারা পালাতে শুরু করে। ভয়ানক বিশৃংখল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শুরুতেই ভেঙে পড়ে মুসলিম বাহিনীর গোটা শৃংখলা। এই শৃংখলা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মহানবী (সা) স্থিরভাবে বসেছিলেন তাঁর ঘোড়ার পিঠে। হযরত আব্বাস (রা) দাঁড়িয়েছিলেন ঘোড়ার লাগাম ধরে, আর আবু সুফিয়ান ধরেছিলেন ঘোড়ার রেকাব। আশেপাশে ছিল দু'তিনজন মাত্র মুসলিম সৈনিক।

মহানবী (সা)-কে একা দেখে ছুটে আসছে শত্রু-বাহিনী মহা সোরগোল তুলে, আর আস্ফালন করতে করতে।

এই ঘোরতর বিপদ মুহূর্তে মহানবীর মুখে ভয় বা ভাবনার কোন চিহ্ন নেই।

এ সময় মহানবী (সা) ধীর-স্থিরভাবে ঘোড়া থেকে মাটিতে অবতরণ করলেন এবং নতজানু হয়ে পরম প্রভু রাব্বুল আলামিনের কাছে একান্ত প্রার্থনা জানালেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আরোহণ করলেন ঘোড়ায় এবং দ্রুত ছুটলেন অগ্রসরমান সহস্র শত্রুসেনার দিকে।

হযরত আব্বাস ও আবু সুফিয়ান আতংকিত হয়ে মহানবীকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন।

মহানবী (সা) দৃঢ়কণ্ঠে, গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আনান্নাবী লা কাজেব, আনা ইবন আবদুল মোত্তালেব' (আমি নবী, আমাতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই, আমি আবদুল মোত্তালিব বংশের সন্তান)।

মহানবী (সা)-এর মুখমণ্ডল তখন বিশ্বাসের প্রভায় অপরূপ, দীপ্ত।

মহানবীর দিকে তাকিয়ে এবং তাঁর তেজোদীপ্ত ঘোষণা শুনে হযরত আব্বাস এবং আবু সুফিয়ান বিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং তাঁকে বাধা দেবার আর শক্তি পেলেন না।

একদল শত্রু মহানবীর (সা) একদম সামনে এসে পড়েছিল।

মহানবী তাদের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র ব্যবহার করলেন না। তিনি এক মুষ্ঠি ধুলা মাটি তুলে নিয়ে ছুড়ে মারলেন তাদের দিকে।

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়া ধুলাক্রান্ত সৈনিকরা চোখ মুছতে মুছতে পেছনে হটে গেল।

ইতোমধ্যে মহানবী (সা) একা একা ছুটে যাবার দৃশ্য দেখে এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত মুসলিম সৈনিকরা ছুটে আসতে লাগল মহানবীর দিকে।

অন্যদিকে হযরত আব্বাস উঠেছেন এক পাহাড় টিলায়। সেখান থেকে হযরত আব্বাসের স্বভাবসিদ্ধ দরাজ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো "হে আনসার বীরগণ, হে শাজরার বাইয়াত গ্রহণকারীগণ, হে মুসলিম বীরবৃন্দ। হে মুহাজিরগণ কোথায় তোমরা? এদিকে ছুটে এসো।"

বিক্ষিপ্ত, বিশৃংখল সৈনিকরা সমবেত হবার জন্যে একটা কেন্দ্রের সন্ধান করছিল।

এই আহ্বানের সাথে সাথে মুসলিম সৈনিকরা বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রের যে যেখানে ছিল সেখান থেকে দলে দলে ছুটে আসতে লাগল। শত শত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল, 'ইয়া লাব্বায়েক, ইয়া লাব্বায়েক' (এই যে হাজির, হাজির)।

হযরত আব্বাসের ভাষায় "সদ্যপ্রসূত গাভী যেমন তার বাছুরের বিপদ দর্শনে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে, আমার আহ্বান শুনে মুসলমানরা সেভাবে ছুটে আসতে লাগল।"

মুসলিম বাহিনীর ব্যূহ আবার নতুন করে রচিত হলো। পতাকাগুলো আবার তুলে ধরা হয়েছে।

মহানবী (সা) এক মুঠো কংকর শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, 'শত্রু পরাস্ত, যাও অগ্রসর হও।'

মুসলিম বাহিনী বন্যাবেগের মতো আপতিত হলো শত্রু সৈন্যের উপর।

প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল।

অবশেষে হাওয়াজিন ও সাকিফদের অজেয় বলে কথিত বাহিনী স্ত্রী-পুত্র, রণসম্ভার ও সমস্ত ধনদৌলত যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে পালিয়ে বাঁচল।

হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াজিনরা তাদের সমুদয় ধন-সম্পদ এবং স্ত্রী-পুত্র পরিজন ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল।

এই 'মালে গণিমত' ও বন্দীদের উপর ছিল যুদ্ধে যোগদানকারী প্রতিটি মুসলমানের হক। সর্বসম্মত যুদ্ধ-আইন অনুসারে তাঁদের মধ্যেই এসব বণ্টন করে দেবার কথা। কিন্তু মহানবী (সা) ধন-সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী সবকিছুই মক্কার জি'রানা নামক স্থানে সযত্নে রক্ষা করলেন। তার ইচ্ছা ছিল সর্বস্বান্ত হয়ে পড়া হাওয়াজিনরা এসে এসব ফিরে পাবার প্রার্থনা করলে তাদের এসব ফেরত দেবার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু সপ্তাহকাল অপেক্ষার পরেও যখন তারা এল না, তখন মহানবী (সা) ধন-সম্পদগুলো মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

দু'সপ্তাহ পরে হাওয়াজিনরা এল।

হাওয়াজিনদের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মহানবীর (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে কাতর কণ্ঠে আরজ করল, "মুহাম্মাদ! আজ আমরা আপনার করুণা ভিক্ষা করতে এসেছি। আমাদের অপরাধ ও অত্যাচারের দিকে আপনি তাকাবেন না। হে আরবের সাধু, নিজ গুণে আমাদের প্রতি দয়া করুন।"

মহানবী (সা) দয়ার সাগর। মানুষের দুঃখ-বেদনা মোচন করে আলোর পথে নেয়ার জন্যেই তো তাঁর আগমন।

হাওয়াজিনদের করুণ অবস্থায় অভিভূত হয়ে পড়লেন মহানবী (সা)। কিন্তু কি করবেন তিনি! হাওয়াজিনরা দেরী করায় তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের ধন-সম্পদ সমুদয় বণ্টন হয়ে গেছে। বাকি আছে ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী নর-নারী। কিন্তু মুক্তিপণ ছাড়া তাদের ছেড়ে দিতে কেউ রাজী হবে না। সবদিক ভেবে মহানবী (সা) ওদের বললেন, "তোমাদের জন্যে অনেক অপেক্ষা করেছি। ধন-সম্পদ ফিরে পাবার কোন উপায় তোমাদের আর নেই। বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবছি। আমার ও আমার স্বগোত্রীয়দের প্রাপ্য বন্দীদের বিনাপণে মুক্তি দেবার ভার আমি নিতে পারি। অন্যান্য মুসলমান ও অমুসলমানদের অংশ সম্বন্ধে আমি এখন জোর করে কোন কথা বলতে পারছি না। তোমরা নামাযের সময় এসো

এবং নামায শেষে সকলের কাছে প্রার্থনা জানাও। আমি যা বলার তখন বলব।"

নামাযের সময়।

নামাজ শেষ হতেই হাওয়াজিন প্রতিনিধিরা উঠে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে কাতর কণ্ঠে তাদের বন্দীদের মুক্তি প্রার্থনা করল।

হাওয়াজিনদের কথা শেষ হবার সাথে সাথে মহানবী (সা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "তোমাদের এই ভাইয়েরা অনুতপ্ত হৃদয়ে তোমাদের কাছে তাদের বন্দী স্বজনদের মুক্তি প্রার্থনা করছে। আমি এ ব্যাপারে তোমাদের সকলের মতামত জানতে চাই। তবে তার আগে আমার মতটা তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে, আবদুল মুত্তালেব গোত্রের প্রাপ্য সমস্ত বন্দীকেই আমি বিনা পণে মুক্তি দিয়েছি।"

মহানবীর (সা) মত জানার পর একে একে মুহাজির ও আনসার দলপতিরা আনন্দের সাথে তাঁদের নিজ নিজ গোত্রের প্রাপ্য অংশের দাবী পরিত্যাগ করলেন। দু'একজন গোত্রপতি শক্র হাওয়াজিনদের বন্দীদের বিনাপণে মুক্তি দিতে অমত প্রকাশ করলেন। তাদের কোন প্রকার চাপ না দিয়ে মহানবী (সা) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদের প্রাপ্য ক্ষতি পূরণের জন্যে আমি দায়ী রইলাম। প্রথম সুযোগেই এই ঋণ আমি পরিশোধ করে দেব।"

হাওয়াজিনদের ছয় হাজার বন্দীর সবাই মুক্তি পেল। এক কপর্দক মুক্তিপণও হাওয়াজিনদের উপর চাপানো হলো না।

বিদায় দেবার সময় মহানবী (সা) ছয় হাজার বন্দীর সকলকে নতুন কাপড় পরিয়ে দিলেন।

বন্দী মুক্তির এমন দৃশ্য দুনিয়া আর কখনও দেখেনি, দেখবেও না কোনদিন।

হুনাইন যুদ্ধের 'মালে গণিমত' (যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ) বন্টন করলেন মহানবী (সা)।

যুদ্ধলব্ধ সব সম্পদই তিনি বন্টন করলেন ইসলামে নবদীক্ষিত কুরাইশদের মধ্যে। মদীনার আনসাররা কিছুই পেল না।

মদীনার মুনাফিকরা একে একটা মহা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় লেগে গেল তারা।

তাদের কুমন্ত্রণায় কতিপয় অদূরদর্শী আনসার যুবক প্রভাবিত হয়ে পড়ল। তারা প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল। অনেক আনসারের মধ্যে এ ভাবনারও সৃষ্টি হলো যে, মহানবী (সা) এবার হয়তো স্বদেশ মক্কাতেই অবস্থান করবেন এবং আমরা তাঁর সেবা করার সুযোগ পাব না।

এসব কথা আনসারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কানাঘুষা হতে লাগল।

বিষয়টা মহানবী (সা) জানতে পারলেন। সকল আনসারকে ডাকলেন তিনি।

আনসারদের এ সভায় তিনি প্রশ্ন করলেন, যা তিনি শুনেছেন তা সত্য কিনা?

আনসার প্রধানগণ খুবই লজ্জিত ও বিব্রত হলেন। বিনীত কণ্ঠে বললেন তারা, আমাদের দু'একজন যুবকমাত্র এ ধরনের কথা বলেছে, একথা সত্য। সবার একথা নয়।

তাদের কথা শুনার পর মহানবী (সা) গণিমতের মাল বন্টন বিষয়ে বললেন, 'কুরাইশরা নবদীক্ষিত, বিশেষত তারা যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের ক্ষতিপূরণ করে সন্তুষ্ট করার জন্যেই এ ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। আর যারা যা প্রত্যাশা করে, তারা তাইতো পায়।' বলে মহানবী (সা) আনসারদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ছাগল-ভেড়া নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে, আর তোমরা রাসূলকে সাথে নিয়ে বাড়ী ফিরছ?'

আনসাররা সানুনয়ে ও ভক্তিগদগদ কণ্ঠে নিবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে পেয়ে, আপনাকে সেবা করেই আমরা পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ হয়েছি। আমরা যেন এই পরম সম্পদ থেকে বঞ্চিত না হই।'

মহানবী (সা) বললেন, 'জীবনে-মরণে কখনই আনসারদের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ হবে না।'

নবম হিজরী সনের ঘটনা।

এক মহাবিপদ সংবাদ এল মদীনায়।

রোম সম্রাট মদীনা আক্রমণ করতে আসছেন। তাঁর সাথে যোগ দিয়েছে লাখম, জোজম, গাস্সান প্রভৃতি খৃস্টান আরব গোত্রগুলো।

রোম সম্রাট পূর্ণ এক বছরের রণসম্ভার ও রসদাদি সঙ্গে নিয়েছেন এবং সৈন্যদের এক বছরের পুরো বেতন অগ্রিম দেয়া হয়েছে।

সিরিয়া-ফেরত বাণিজ্য বহর খবর দিল, বিশাল রোমক সৈন্যের অগ্রবাহিনী 'বালকা' পর্যন্ত পৌঁছেছে।

খবর শুনে মহানবী (সা) সমগ্র মুসলিম হেজাজের প্রান্তে প্রান্তে স্বধর্ম, স্বজাতি ও স্বদেশের স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যথাসর্বস্ব নিয়ে প্রস্তুত হবার আদেশ প্রদান করলেন। মহানবী (সা) আরও জানিয়ে দিলেন, মদীনা থেকে চারশ' মাইল দূরে আরব সীমান্তের ওপারে সিরিয়ার ভেতর রোমক বাহিনীকে বাধা দেয়া হবে। ঠিক হলো, ত্রিশ হাজার মুসলিম যোদ্ধা এই তাবুক অভিযানে অংশ নেবে।

কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন ও রসদাদি কোথায়?

মহানবী (সা) এই সমরায়োজনে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্যে মুসলমানদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

আহ্বান সকলের কানে পৌঁছল।

কানে পৌঁছার সাথে সাথে যে যেখানে ছিল ছুটল বাড়ীর দিকে যা কিছু সম্ভব তা নিয়ে মহানবীর দরবারে হাজির হবার জন্যে।

হযরত উমর (রা) তাঁর যা কিছু অর্থ-সম্পদ আছে দুইভাগে ভাগ করলেন। একভাগ পরিবারের জন্যে রেখে অন্য অর্ধেক নিয়ে তিনি ছুটলেন মহানবীর দরবারের দিকে।

যেতে যেতে ভাবলেন, সব ভাল কাজেই হযরত আবু বকর প্রথমস্থানে থাকেন, আজ তিনি আবু বকরকে পরাজিত করবেন।

হযরত উমর (রা) তাঁর অর্থ-সম্পদ নিয়ে হাজির হলেন মহানবীর দরবারে। মহানবী (সা) তাঁকে বাড়ীর জন্যে কিছু রেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত উমর (রা) জানালেন তিনি কিভাবে সম্পদ ভাগ করেছেন।

হযরত আবু বকরও তাঁর ধন-সম্পদ মহানবীর চরণে হাজির করেছেন। মহানবী (সা) তাকেও জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবু বকর, পরিবারবর্গের জন্যে কি রেখে এসেছ?'

হযরত আবু বকর বিনীতভাবে বললেন, 'শ্রেষ্ঠতম সম্পদ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমার পরিবারবর্গের জন্যে আছেন।'

সকল মুসলমানই এভাবে তাদের সাধ্য অনুসারে দান করলেন। হযরত উসমান (রা) এসে মহানবীর দরবারে নিবেদন করলেন, এক হাজার উট, সত্তরটি ঘোড়া এবং এর জন্য আবশ্যকীয় সরঞ্জাম এবং সেই সাথে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা।

কিন্তু ৩০ হাজার মুসলিম যোদ্ধার সকলকে যুদ্ধের সরঞ্জাম দেয়া গেল না। কিছু যোদ্ধা বঞ্চিত থাকল। তারা মহানবীর সাথে যুদ্ধে শরিক হতে পারবে না, এই দুঃখে শিশুর মত কান্না শুরু করে দিল।

যথাসময়ে তিরিশ হাজার সৈন্য মহানবীর (সা) নেতৃত্বে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। কিন্তু অতুলনীয় ত্যাগের এই যুদ্ধ প্রস্তুতির মধ্যেই আল্লাহ বিজয় দিয়ে দিয়েছিলেন মুসলমানদের।

মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার তাবুক নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে শুনতে পেলেন, রোম সম্রাটের আরবমুখী বাহিনী ৩০ হাজার মুসলিম সৈন্যের সিরিয়া অভিমুখে ছুটে আসার খবর পেয়ে ফিরে গেছে। সিরিয়ার স্থানীয় খৃস্টান গোত্ররা রোম সম্রাটকে জানিয়েছিল দারিদ্র-তাড়িত মুসলমানরা এখন ভয়ানক দুর্দশায়, তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত নয়। তাদের ধ্বংস করার এটাই উপযুক্ত সময়। কিন্তু ৩০ হাজার মুসলিম সৈন্যের দ্রুত অগ্রাভিযান তাদের খবর মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। মুতা'র যুদ্ধের স্মৃতি তারা ভোলেনি। তাই যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়াই তারা সমীচীন মনে করে।

মহানবী (সা) সিরিয়ার খৃস্টান গোত্রগুলোকে তাদের অপরাধের জন্যে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু মহানবী (সা) তাদের কিছুই বললেন না।

এই অভাবিত ঘটনায় সিরিয়ার খৃস্টানরা অভিভূত হয়ে পড়ল। এমন শত্রু তো শত্রু নয়, আত্মার আত্মীয় এরা। এমন মানুষ, এমন চরিত্র তারা দেখেনি, শোনেওনি। তাবুক অঞ্চলের বিভিন্ন খৃস্টান গোত্র দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। যারা ইসলাম গ্রহণ করল না, তারা বার্ষিক সামান্য কর দিয়ে মদীনার ইসলামী শাসনের অধীন হয়ে গেল।

আবদুল্লাহ্ মহানবীর (সা) একজন সাহাবী।

ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁর নাম ছিল আবদুল ওজ্জা।

পিতৃহীন আবদুল ওজ্জা ছিলো বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী। পিতৃব্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

সুখের সাগরে লালিত আবদুল ওজ্জার বিয়ে হয় এক ধনী কন্যার সাথে।

মক্কায় চলছিল তখন ইসলামের দাওয়াত।

ইসলামের দাওয়াত হৃদয় জয় করে নিল আবদুল ওজ্জার। তিনি ইসলাম গ্রহণের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

একদিন সে পিতৃব্যের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে ইসলাম ধর্মকে সত্য ধর্ম হিসেবে অভিহিত করে অনুরোধ জানালো পিতৃব্যকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে।

পিতৃব্যের কাছে অকল্পনীয় ছিল তার কাছে ভ্রাতুষ্পুত্রের এই আহ্বান। ক্রোধে আগুন হয়ে উঠলেন তিনি। ভ্রাতুষ্পুত্রকে ভয় দেখাবার জন্যে বলে উঠলেন, 'তোর মত নাস্তিক আমার সম্পত্তির এক কপর্দকও পাবে না।'

উত্তরে আব্দুল ওজ্জা সসম্ভ্রমে পিতৃব্যকে বলল, 'তার সম্পত্তি অপেক্ষা সত্য অনেক বড়।'

বলে আবদুল ওজ্জা তার দেহ থেকে বহুমূল্য পোশাক খুলে ফেললেন। ছুটে গেলেন বিধবা মাতার কাছে। বললেন মা, আমাকে লজ্জা নিবারণের মত কাপড় দাও।

তাঁর মা আবদুল ওজ্জার পিতার আমলের এক জীর্ণ কম্বল ছুড়ে দিলেন পুত্রের দিকে।

আবদুল ওজ্জা সেই কম্বল ছিঁড়ে দুই ভাগ করে একখণ্ড পরিধান করলেন, আরেক খণ্ড গায়ে চাপালেন। তারপর ছুটলেন মদীনার দিকে মহানবীর কাছে।

দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা শেষে মসজিদের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন আবদুল ওজ্জা।

আবদুল ওজ্জার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সব বুঝতে পারলেন মহানবী (সা)। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে?'

'আমি আবদুল ওজ্জা, সত্যের সেবক।'

মহানবী (সা) বললেন, 'তুমি আর ওজ্জার দাস নও, তুমি আল্লাহর দাস আবদুল্লাহ। যাও তুমি আত্মোৎসর্গকারী আসহাবে ছুফফার জামায়াতে প্রবেশ কর। আমার নিকট এই মসজিদেই তুমি থাকবে।'

মহানবী (সা) অপরিসীম ভালবাসতেন এই নতুন আবদুল্লাহকে।

ভাবে বিভোর আবদুল্লাহ একদিন উচ্চস্বরে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে থাকায় হযরত উমর বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

মহানবী (সা) উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'উমর, ওকে কিছু বলো না। এই আবেগের কল্যাণেই তো সে নিজের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিতে সমর্থ হয়েছে।'

তাবুক অভিযানের সময় পথিমধ্যে আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

কি সৌভাগ্য আবদুল্লাহর।

স্বয়ং হযরত আবু বকর ও হযরত উমর এগিয়ে এসে তাঁর দেহ কবরে নামাতে লাগলেন। বেলাল তুলে ধরলেন প্রদীপ। আর মহানবী (সা) ব্যাকুল কণ্ঠে তখন বলছেন, 'সসম্ভ্রমে, সসম্ভ্রমে, তোমাদের ভ্রাতাকে সসম্ভ্রমে নামাও।'

বলতে বলতে স্বয়ং মহানবী কবরে নেমে পড়লেন এবং নিজ হাতে তার দেহ কবরে স্থাপন করলেন।

তায়েফের সাকিফ গোত্রের একজন প্রধান ব্যক্তি উরওয়া ইবনে মাসউদ মদীনা এলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন মহানবীর কাছে।

আরবের তৎকালীন প্রথা অনুসারে উরওয়ার অনেক স্ত্রী ছিল।

চারজনের বেশী স্ত্রী মুসলমানদের জন্যে তখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আদেশ জানার সাথে সাথে উরওয়া চারজন স্ত্রী রেখে অন্যদের তালাক দিয়ে দিলেন।

ইসলাম গ্রহণের কয়েকদিন পর উরওয়া মহানবীর কাছে হাজির হলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্বজাতীয়রা অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবে আছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি ফিরে গিয়ে তাদের কাছে সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারি।'

তায়েফের বনি সাকিফ তখনও ইসলামের ভয়ানক বৈরী।

উরওয়ার আবেদন শুনে মহানবী (সা) বললেন, 'উরওয়া, সে তো ভাল কথা। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, তোমার স্বজাতিরা তোমাকে হত্যা করবে।'

উরওয়া বললেন, 'আমার স্বজনরা আমাকে খুবই ভালবাসে।'

উরওয়া তায়েফ ফিরলেন।

এখন উরওয়া আগের সেই উরওয়া নেই। সে এখন সত্যের সৈনিক, আল্লাহর সৈনিক।

সত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান করার কাজ তিনি শুরু করলেন নির্ভীকভাবে, নিরলসভাবে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে উরওয়ার স্বজন-স্বজাতীয়রা উরওয়ার জান-দুশমনে পরিণত হলো। নিপীড়ন-নির্যাতন নেমে এল তাঁর উপর।

এমনকি নিজ বাড়ীতেও উরওয়ার পক্ষে একটু শান্তিতে-স্বস্তিতে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

একদিন উরওয়া তাঁর নিজ বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করছিলেন। লোকরা এসে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াল। শুরু হলো উরওয়ার প্রতি তীর ও পাথর বর্ষণ।

তীর ও পাথরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠল উরওয়ার দেহ। কিন্তু উরওয়ার মুখ মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হয়নি আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন থেকে।

একটা তীর এসে উরওয়ার বক্ষ ভেদ করল। উরওয়ার মুখে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হলো 'আল্লাহু আকবার।'

তার মুখে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি শেষ হবার সাথে সাথে উরওয়ার রক্তরঞ্জিত দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তাঁর স্বজনরা মুমূর্ষু উরওয়ার কাছে এসে বিদ্রূপ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন বুঝছ?'

উরওয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "সত্যের সেবায় ও দেশবাসীর কল্যাণে যে রক্ত উৎসর্গ করা হয়, তা শুভ এবং পুণ্যময়। আল্লাহ্ আমাকে এই সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন, সত্যের সেবায় জীবন দিয়ে আমি শহীদদের সাথে মিলিত হবার জন্যে চললাম।"

উরওয়ার কণ্ঠ নীরব হলো। সেই সাথে পরম আকাঙ্ক্ষিত শহীদী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন উরওয়া।

ভয়ংকর ছোমামা মহানবীর অতিথি হলো

বনু হানিফা আরবের একটা বিখ্যাত গোত্র। মক্কা ও ইয়েমেনের মধ্যপথ ইয়ামামায় তাদের বাস। একটা অভিযানকালে বনু হানিফার একজন প্রধান ব্যক্তি ছোমামা ইবনে ওছাল মুসলমানদের হাতে বন্দী হলেন।

তাকে আনা হল মদীনায়।

খুব বিপজ্জনক বন্দী ছোমামা।

তাকে মসজিদের একটা থামে বেঁধে রাখা হয়েছে।

খবর পাওয়ার পর মহানবী (সা) তার কাছে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছোমামা, তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হবে বলে মনে করছ?'

ছোমামা উত্তরে বলল, "ভালই মনে করছি। আমি খুনের অপরাধী, আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে হত্যা করতে পারেন। তবে আপনার কাছে আমি প্রতিশোধের বদলে ক্ষমা লাভ করার আশা করি। আপনি দেখবেন, আমি কত কৃতজ্ঞ, কত ভদ্র। আর বিনিময় হিসাবে অর্থ গ্রহণ করতে চাইলে বলুন, যা চাইবেন দিতে প্রস্তুত আছি।'

কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে মহানবী (সা) তাকে নিজের মেহমান হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

রাতে মহানবী (সা) ছোমামাকে খাবার দিলেন। মহানবীর পরিবারের সব খাবার সে একাই শেষ করল।

পরদিন সকালে মহানবী (সা) তাকে বললেন, 'ছোমামা, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, তুমি এখন মুক্ত।'

মুক্তির এই বার্তা পেয়েই মসজিদের নিকটস্থ ক্ষুদ্র জলাশয়টিতে গোসল করল ছোমামা। তারপর মহানবীর (সা) খেদমতে হাজির হয়ে উচ্চস্বরে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে সত্য ধর্মে প্রবেশ করলেন।

কিছুদিন মদীনায় অবস্থানের পর ছোমামা ফিরে গেলেন তাঁর স্বদেশে। তাঁর একক প্রচারেই অল্পকালের মধ্যে বনু হানিফার সকল মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হলো।

তারিক ইবনে আবদুল্লাহর একটি স্মৃতি কথা "আমি একদিন মক্কার 'মাজাজ' নামক বাজারে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় দেখলাম, একজন অত্যন্ত প্রিয়-দর্শন লোক বাজারের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন, 'হে মানব সকল, তোমরা বল আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

এই সঙ্গেই দেখলাম, আর একটা লোক তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরছেন আর বলে বেড়াচ্ছেন, 'খবরদার, কেউ এর কথা শুনোনা। এ একটা ভয়ংকর যাদুকর, মস্ত একটা মিথ্যাবাদী।' এইসব কথা বলার সাথে সাথে পেছনের লোকটি তাঁকে পাথর ছুড়ে মারছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলে আমার সাথের একজন বয়স্ক লোক বললেন, প্রথম লোকটি হাশেম বংশের। তিনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বলে মনে করেন। আর দ্বিতীয় লোকটি তাঁর চাচা আবদুল ওজ্জা– আবু লাহাব।

এই ঘটনার অনেক বছর পরের কথা।

মদীনার বাইরে একটা খোরমা বাগানে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি। আমরা খেজুর কিনতে মদীনায় এসেছি।

আমরা যখন বাগানে বিশ্রামরত, তখন একজন লোক এসে আমাদের সালাম দিল।

তাঁর পরনে তহবন্দ এবং গায়ে চাদর। তিনি আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর কণ্ঠ খুবই মধুর।

আমাদের সাথে একটা লাল রঙের উট ছিল। পরিচয় জিজ্ঞাসার পর তিনি লাল উটটি আমরা বিক্রি করব কিনা, কত দাম জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম, এত মণ খেজুর পেলে উটটা আমরা বিক্রি করতে পারি।

তিনি কোন প্রকার দর-কষাকষি না করে আমাদের দাবীকৃত মূল্যে উট কিনতে রাজী হলেন এবং উটের দড়ি ধরে টেনে উট নিয়ে চললেন নগরীর দিকে।

তিনি চলে যাবার পর আমাদের চেতনা হলো যে, একি করলাম আমরা? দাম না নিয়ে একজন অপরিচিত লোককে উট নিয়ে যেতে দিলাম।

আমাদের সাথে একজন বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বললেন, 'চিন্তা করো না। লোকটার মুখ পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত। এমন লোক কখনই প্রবঞ্চক হতে পারে না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, টাকার জন্যে আমি দায়ী রইলাম।'

অল্প কিছুক্ষণ পর নগরীর দিক থেকে একজন লোক আমাদের কাছে এলেন। তাঁর সাথে প্রচুর খেজুর। তিনি আমাদের বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর নিকট থেকে এসেছি। উটের মূল্য বাবদ এই খেজুর তিনি পাঠিয়েছেন। ওজন করে নিন। আরও কিছু খেজুর তিনি পাঠিয়েছেন উপঢৌকন স্বরূপ আপনাদের খাওয়ার জন্যে। আপনারা গ্রহণ করলে তিনি খুশী হবেন।'

যথাসময়ে আমরা মদীনা প্রবেশ করলাম। পৌঁছলাম আমরা মসজিদে নববীর সামনে। দেখলাম সেই লোকটি মসজিদের মিম্বারে বসে লোকদের উদ্দেশ্যে কথা বলছেন। আমরা শেষের এই কয়টি কথা শুনতে পেয়েছিলাম, 'হে লোক সকল, অভাবগ্রস্ত ও কাঙ্গালদের দান কর। তোমাদের জন্যে এটা বিশেষ কল্যাণকর। স্মরণ রেখ, উপরের (দাতার) হাত নিম্নের (গ্রহীতার) হাত অপেক্ষা উত্তম। পিতা-মাতা ও অন্যান্য স্বজনদের প্রতিপালন কর।'

আমরা কয়েকদিন মদীনায় থাকলাম। আমরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে দেশে ফিরে এলাম। গিয়েছিলাম মদীনায় ব্যবসায়ী হয়ে, ফিরে এলাম দেশে ইসলামের প্রচারক হয়ে।

ইয়েমেন সীমান্ত ঘেঁষে নাজরান একটা বিশাল ভূভাগ। আরবের সবচেয়ে বড় খৃষ্টান কেন্দ্র হিসেবে এটা পরিচিত।

নাজরানের বিশপের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে একটা চিঠি পাঠালেন মহানবী (সা)।

চিঠি পেয়ে নাজরানের গীর্জার প্রধান বিশপ কি করণীয় তা ভেবে বিচলিত হয়ে পড়লেন। অনেকের সাথে পরামর্শ করলেন। কেউ বললেন, 'একালে একজন ভাববাদীর আগমন ঘটবে, একথা অনেক দিন থেকে শুনে আসছি। আপনিই কর্তব্য ঠিক করুন।' তবে সকলেই এক বাক্যে বলল, এসব ধর্ম সম্পর্কিত জটিল সমস্যা, আপনাদের ন্যায় ধর্মগুরুরাই এর সমাধান করতে পারেন।'

নাজরানের একটা নিয়ম হলো, কোন গুরুতর সংকট বা ভয়ংকর কোন বিপদ উপস্থিত হলে গীর্জার উপর চট ঝুলিয়ে দিয়ে অবিরাম ঘন্টা বাজানো হয়।

বিশপ ভেবে-চিন্তে গীর্জায় চট ঝুলানো ও ঘন্টা বাজানোর নির্দেশ দিলেন।

নাজরান অঞ্চলের ৭৩টি গ্রাম নিয়ে গীর্জার সাম্রাজ্য। গীর্জার বিপদ-ঘণ্টা শুনে হাজার হাজার লোক ছুটে এল গীর্জায়।

গীর্জার সামনে বিশাল প্রান্তর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

লক্ষাধিক লোক সামনে রেখে গীর্জার ব্যালকনিতে দণ্ডায়মান হলেন প্রধান বিশপ আয়হারা। অসীম সম্মানের পাত্র তিনি। নাজরানবাসীর উপর তাঁর অতুল প্রভাব।

তিনি লোকদের উদ্দেশ্য করে মদীনা থেকে প্রাপ্ত মহানবীর পত্র পাঠ করে সবাইকে শুনালেন এবং করণীয় স্থির করার আহ্বান জানালেন।

চিঠি পাঠের পর আলোচনা করে স্থির হলো, প্রধান বিশপ ও যাজক নাজরানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে অবিলম্বে মদীনা যাত্রা করবেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে নবধর্মের খবর নিয়ে ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার পর করণীয় ঠিক করবেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নাজরানের ৬০ জন যাজক ও প্রধান ব্যক্তির একটা প্রতিনিধি দল মদীনা এল।

মদীনা এসে প্রথমেই তারা মসজিদে নববীতে উপাসনা করার অনুমতি চাইলেন। মহানবী (সা) অস্বাভাবিক হলেও এ অনুমতি তাদের দিলেন। নাজরান প্রতিনিধিরা নিশ্চিত ধরে নিয়েছিল এ অনুমতি তারা পাবে না। অনুমতি পাওয়ায় তারা বিস্মিত হলো।

মদীনা আসার আগেই নাজরান প্রতিনিধিরা পরিকল্পনা এঁটেছিল মহানবীর সাথে 'মোলাআনা' করার। অর্থাৎ পরস্পর এইভাবে কসম করা যে, 'আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর লানত হোক।'

কিন্তু মহানবীর সাথে সাক্ষাত হবার পর তাঁর মুখ দেখে তাদের হৃদয় কেঁপে উঠল। তাঁরা সকলেই একমত হলো যে, তাঁর সাথে 'মোলাআনা' করে কাজ নেই। প্রকৃতই উনি যদি নবী হন, তাহলে আমাদের সর্বনাশ হবে।

তারপর নাজরান প্রতিনিধিদল দীর্ঘ সময় ধরে রাসূলুল্লাহর সাথে ধর্মের জটিল সব প্রসংগ নিয়ে আলাপ করল। তারা বুঝে গেল, ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলাপ করে তাঁর সাথে সুবিধা করা সম্ভব নয়। ওদিকে 'মোলাআনা' করার আশা তাদেরকে আগেই ত্যাগ করতে হয়েছে।

এই অবস্থায় নাজরান প্রতিনিধিদল মদীনার সাথে রাজনৈতিক সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তারা আন্তর্জাতিক আরব গণতন্ত্রের (International Arab Federation) মেম্বার হবার আগ্রহের কথা জানালেন এবং এই কমনওয়েলথের সদস্য হবার জন্য তাদের কি দিতে হবে তা ঠিক করে দেয়ার জন্য মহানবীকেই অনুরোধ করলেন।

এরপর মহানবী (সা) নাজরানবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে নিম্নোক্ত সনদ ঘোষণা করলেন :

"তাদের (নাজরানবাসীদের) উপস্থিত, অনুপস্থিত, স্বজাতীয় ও অনুগত সকলের জন্য আল্লাহর নামে তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, সকল প্রকার সম্ভব চেষ্টার দ্বারা আমরা তাদের নিরাপদ রাখব। তাদের দেশ, তাদের বিষয়-সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ এবং তাদের ধর্ম ও ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন অব্যাহত ও নিরাপদ থাকবে। তাদের কোন সমাজগত আচার-ব্যবহারের কোন বিষয়গত স্বত্বাধিকারের এবং কোন ধর্মগত সংস্কারের উপর কখনও কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। কম বেশী যা কিছু তাদের আছে, তা সম্পূর্ণরূপে তাদেরই থাকবে। মুসলমানরা তাদের নিকট থেকে অর্থবিনিময় ব্যতীত কোন প্রকার উপকার গ্রহণ করতে পারবে না। তাদের কাছ থেকে 'ওশর' (ফসলের উপর অবশ্য দেয় অংশ) গ্রহণ করা হবে না, তাদের দেশের মধ্য দিয়ে সৈন্য চালনা করা হবে না। আল্লাহর নামে তাদের আরও প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে যে, কোন ধর্মযাজককে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা হবে না, কোন পুরোহিতকে পদচ্যুত করা হবে না। কোন সন্ন্যাসীর সাধনায় কোনও প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করা হবে না। যত দিন তারা শান্তি ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করবে, ততদিন এই সনদের লিখিত সব শর্ত সমানভাবে বলবৎ থাকবে।"

মদীনার সনদের পর পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে জাতিগত সহাবস্থানের এ এক অনন্য দলিল। মদীনার সনদ ছিল কিছুটা স্থানীয় পর্যায়ের, কিন্তু এই 'নাজরান সনদ' একটা কমনওয়েলথ ব্যবস্থার অধীনে জাতিগত সহাবস্থানের আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক দলিল।

বিদায় হজ্বের দীর্ঘ অভিভাষণ মহানবী (সা) শেষ করলেন এই কথা বলে "যারা উপস্থিত আছে, তারা অনুপস্থিতদেরকে আমার এ সকল 'পয়গাম' পৌঁছে দেবে। হয়তো উপস্থিতদের কতক লোক অপেক্ষা অনুপস্থিতদের কতক লোক এর দ্বারা অধিকতর উপকৃত হবে।"

আল্লাহর বাণী, সত্যের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার মহামিশন যেন তিনি শেষ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল বেহেশতী পুণ্য প্রভায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর সত্যের তেজে ক্রমশঃই দৃপ্ততর হয়ে উঠছে। তাঁর চোখ দু'টিতে পরম প্রভুর জন্য ভক্তি গদগদ অসীম আকুলতা।

মুখ উপরে তুলে তিনি চাইলেন উর্ধাকাশে এবং উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ, আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি, আমি কি নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেছি?'

আরাফাতের গোটা প্রান্তর থেকে লাখ কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, 'নিশ্চয় ইয়া রাসূলাল্লাহ।'

মহানবী (সা) তখন আরও আবেগ-ভরা কণ্ঠে পরম প্রভুর উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে আমার আল্লাহ, আপনি শ্রবণ করুন, আপনি সাক্ষী থাকুন, এরা স্বীকার করছে, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।"

মহানবী (সা) এরপর দৃষ্টি ফিরিয়ে চাইলেন আরাফাতের লাখ জনতার দিকে। বললেন, "হে লোক সকল, আমার সম্পর্কে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। তোমরা সে প্রশ্নের কি জবাব দেবে জানতে চাই।"

আরাফাতের পর্বত ও প্রান্তর জুড়ে ধ্বনিত হলো লাখো কণ্ঠের আবেগ-মথিত উত্তর, "আমরা সাক্ষ্য দেব, আপনি আমাদের পরম প্রভু আল্লাহর বাণী আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন, আপনি আপনার কর্তব্য সম্পূর্ণ পালন করেছেন।"

মহানবী (সা) তখন অপূর্ব এক ভাবে বিভোর। তিনি আকাশের দিকে অঙ্গুলি তুলে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'প্রভু হে শ্রবণ করুন, প্রভু হে সাক্ষী থাকুন, হে আমার আল্লাহ সাক্ষী থাকুন।'

শেষ হয়েছে আরাফাতের বিদায় হজ্বের ভাষণ।

শেষ হলো উপস্থিত লাখো জনতার সাথে তাঁর শেষ কথা। পরম প্রভুকেও সাক্ষী রাখলেন তিনি তার মিশনের সম্পূর্ণতা বিষয়ে।

বাকী ছিল পরম প্রভু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে পরম একটি সুসংবাদের।

দয়াময় আল্লাহ্ কি পারেন তার প্রিয়তম বান্দাহ্ ও প্রিয়তম রাসূলকে তাঁর পরম সন্তুষ্টির কথা না জানিয়ে?

আরাফাতের ভাষণ শেষ হবার পরপরই মহানবীর প্রতি অবতীর্ণ হলো মর্তের বান্দাদের জন্য মহিমাময় প্রভুর পরম সন্তোষের বাণী আল-কুরআনের এই আয়াত :

"তোমাদের মঙ্গল হেতু তোমাদের দ্বীনকে আজ পূর্ণ, পরিণত করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সুসম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীনরূপে মনোনীত করে দিলাম।"

একাদশ হিজরী সাল।

বিদায় হজ্ব শেষে মহানবী (সা) মদীনায় ফিরেছেন। ফিরবার পর পৃথিবীর সমস্ত কাজ-কাম সমাধা করার জন্যে মহানবী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যেন তিনি কোন মহাযাত্রার আয়োজন শুরু করে দিয়েছেন।

হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পথেই তাঁর প্রিয় সাহাবীদের কবরগাহ্ জান্নাতুল বাকিতে রাতের একটা দীর্ঘ সময় তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের জন্যে দোয়া করেছেন এবং তাঁদের কাছে বিদায় নিয়েছেন।

জান্নাতুল বাকি থেকে ফিরে আসার পর সফর মাসের শেষার্ধের প্রথমভাগে মহানবীর মধ্যে পীড়ার সূত্রপাত ঘটলো।

বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলছেন, ইন্তিকালের একমাস আগেই হযরত তাঁর মৃত্যু সংবাদ সকলকে জানিয়েছিলেন।

মহানবী (সা) অসুস্থ হয়ে পড়ার পর যেন সেই চির বিদায়ের মহাসময়টাই ঘনিয়ে এলো।

এ সময় একদিন মহানবী (সা) আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর বাড়ীতে সবাইকে ডাকলেন।

সকলে উপস্থিত হলে মহানবী (সা) বললেন,

"হে লোক সকল, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ তোমাদের উপর রহম করুন। তাঁর সাহায্য ও শক্তিবলে তোমরা জীবনের কর্মসময়ে জয়যুক্ত ও কল্যাণমণ্ডিত হও। তিনি তোমাদের মহত্ত্ব দান করুন, সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং সততা অর্জনের শক্তি দান করুন। তাঁর আশ্রয়ে তোমরা নিরাপদ থাক।

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নামে ধর্মভীরু হবার অছিয়ত করছি। তোমাদেরকে আমি তাঁরই মঙ্গল-হাতে সমর্পণ করে যাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ন্যায়দণ্ড সম্বন্ধে বিশেষরূপে সতর্ক করে বলছি যে, সাবধান, কোন দেশের কোন

জাতির উপর অন্যায় আচরণ করো না, এতে তোমরা তাঁর (আল্লাহর) বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্ আমাকে ও তোমাদেরকে বলছেন, "পরকালের পরম শান্তির নিবাস আমি সে সকল লোকদের জন্য (নির্ধারিত) করব যারা পৃথিবীতে আত্মম্ভরিতা করতে ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায় না। সংযমশীল লোকেরাই পরিণামে কল্যাণ লাভ করে থাকে।" তোমরা ভবিষ্যতে যেসব বিজয় লাভ করবে তা আমি দেখতে পাচ্ছি। তোমরা আমার পর মুশরিক হয়ে যাবে, সে আশংকাও আমার নেই। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমার পর তোমরা ধন-সম্পদের মায়ামোহে মুগ্ধ না হয়ে পড়, এ নিয়ে তোমরা পরস্পর রক্তপাত ঘটাতে প্রবৃত্ত না হও এবং সে অপকর্মের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলস্বরূপ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় তোমরা বিধ্বস্ত হয়ে না যাও।

তোমরা আমার অনুপস্থিত সাহাবীদের আমার সালাম পৌঁছে দেবে। আর আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যারা আমার প্রচারিত দ্বীনের অনুসরণ করবে, তোমাদের মাধ্যমে তাদের প্রতিও আমার সালাম অনন্ত-অফুরন্ত দোয়া।"

মহানবীর (সা) চির বিদায়ের পাঁচ দিন আগের কথা।

সেদিন মহানবীর (সা) পীড়ার তীব্রতা খুবই বৃদ্ধি পেল। রোগ-যন্ত্রণায় তিনি অস্থির।

কিন্তু এর মধ্যেও তিনি তাঁর শেষ কথাগুলো মানুষকে জানাবার জন্য ব্যস্ত। তিনি সেখানে উপস্থিত মুসলিম নর-নারীদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

"তোমাদের আগের জাতিগুলো তাদের পরলোকগত নবী ও বুজুর্গদের কবরগুলোকে উপাসনালয়ে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা যেন এই মহাপাপে নিজেদের লিপ্ত করো না। খৃস্টান ও ইহুদীরা এই পাপে অভিশপ্ত হয়েছে। দেখ, আমি নিষেধ করছি আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করে যাচ্ছি, সাবধান আমার কবরকে সিজদাগাহ বানাবে না। আমার এই চরম অনুরোধ অমান্য করলে তজ্জন্য তোমরাই আল্লাহর নিকট দায়ী হবে। হে আল্লাহ, আমার কবরকে 'পূজাস্থলে' পরিণত করতে দিও না।"

আর একদিনের কথা।

অসুস্থ মহানবী (সা) মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করলেন। সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "আল্লাহ তাঁর একজন দাসকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দান করলেন। কিন্তু সে দাস তা গ্রহণ না করে আল্লাহকে গ্রহণ করলো।"

এই কথা শ্রবণ করে আবুবকর (রা) কাঁদতে শুরু করলেন।

আবুবকর (রা)-এর কান্না দেখে অনেকে বলাবলি করতে লাগল, বৃদ্ধের হঠাৎ আজ কি হলো! আল্লাহর নবী একজন লোকের গল্প বলছেন, আর উনি কেঁদে আকুল হচ্ছেন!

এ যে ছিল মহানবীর আশু বিদায়ের ইঙ্গিত, তা অনেকেই বুঝতে পারেননি।

সেদিন মহানবী (সা)-এর পীড়ার ১১তম দিন।

অসুস্থতা সত্ত্বেও এতদিন মহানবী (সা) মসজিদে নববীর নামাযের জামায়াতে নিজেই ইমামতি করে এসেছিলেন। আজকেও তিনি উঠেছেন নামাযের জন্যে।

ওজু করতে লাগলেন।

মাথা ঘুরতে লাগল তাঁর।

পরপর তিনবার চেষ্টা করেও তিনি পারলেন না ওজু করতে।

ক'দিন ধরে তাঁর ব্যাধির তীব্রতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছিল। খাইবারের সেই ইহুদীনির খাওয়ানো বিষের জ্বালাও মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। আজ অবশেষে তিনি পারছেন না সাহাবীদের সাথে নামাযে শরিক হতে।

জামায়াতে উপস্থিত সাহাবীদের তিনি বলে পাঠালেন, 'আবু বকরকে নামাযে ইমামতি করতে বলো।'

আবু বকরকে নবীর স্থানে ইমামতিতে দাঁড়াতে দেখে সাহাবীরা ধৈর্য আর রাখতে পারলেন না। কান্নায় আকুল হলেন সবাই।

এর মধ্যেই ধৈর্যের মহাপ্রতীক আবু বকর (রা) নামাযের ইমামতি শুরু করে দিলেন। এ সময় মহানবী (সা) একটু আরামবোধ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দু'জন আত্মীয়ের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে এলেন।

আবু বকরের ইমামতিতে তখন নামায চলছিল।

মহানবী (সা)-কে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্যে সরে দাঁড়াচ্ছিলেন আবু বকর (রা)।

মহানবী (সা) তাঁকে নিষেধ করলেন এবং মহানবী (সা) আবু বকরের পাশে বসে নামায পড়লেন।

নামাযের পর মহানবী (সা) ফিরে বসে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে মুসলিমগণ, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করে যাচ্ছি। তাঁর আশ্রয় ও তাঁর সাহায্যের কাছে তোমাদের সঁপে দিচ্ছি। আল্লাহই তোমাদের রক্ষা করবেন। তোমরা নিষ্ঠা, ভক্তি ও সততার সাথে তাঁর আদেশ পালন করতে থেকো। তাহলে তিনি তোমাদের রক্ষা করবেন। এই শেষ ভ্রাতৃবর্গ, এই শেষ।"

সেদিন সোমবার।

চরম বেদনা-বিধুর এক সোমবার।

চির বিদায়ের দিন মহানবীর।

তখন সুবহে সাদিক।

মসজিদে নববীতে ফজরের জামায়াতে সমবেত হয়েছেন সাহাবীরা।

নামায তখন আরম্ভ হয়েছে।

এ সময় মহানবীর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল তাঁর পরেও আল্লাহর বান্দারা কিভাবে মহাপ্রভুর উপাসনায় লিপ্ত থাকে তা দেখার জন্য।

তিনি তাঁর কামরার পর্দা তুলে দিতে বললেন। পর্দা উঠে যেতেই মসজিদে নববীতে সাহাবীদের নামাযের জামায়াত দৃশ্যমান হয়ে উঠল।

এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে সেই অন্তিম সময়েও মহানবীর মুখ-মণ্ডলের রোগ-ক্লিষ্টতা যেন দূর হয়ে গেল। আনন্দ-উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর বদনমণ্ডল। ঠোঁটে দেখা দিল তাঁর হাসির রেখা।

সাহাবীদের দিকে চেয়ে শেষবার যেন হাসলেন মহানবী (সা)।

সেই শেষ দিনের আরেক দৃশ্য।

রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লেন রাহমাতুললিল আলামিন। শেষ নবী, মহানবী (সা)।

শিয়রে বসে ছিলেন স্নেহের দুলালী ফাতিমা (রা)।

যন্ত্রণাকাতর পিতার দিকে চেয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'হায়, আমার পিতা না জানি কত কষ্ট পাচ্ছেন।'

স্নেহের দুলালী কন্যা ফাতিমার এই বিলাপ শুনে মহানবী বললেন, 'ফাতিমা, আর অল্প সময় তোমার পিতার কষ্ট, আজকের পর আর কষ্ট নেই।'

মহানবীর পাশে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)। যন্ত্রণা-পীড়িত মহানবীর একটা অভিপ্রায় তিনি বুঝলেন। উম্মুল মুমিনীন একটা মেছওয়াক চিবিয়ে মহানবীর

হাতে দিলেন। তা নিয়ে মহানবী (সা) ধীরে ধীরে দাঁতে বুলালেন। নিকটে পানির একটা পাত্র ছিল। পাত্র থেকে হাতে করে পানি নিয়ে মুখে দিতে দিতে তিনি বললেন, "মৃত্যুর অনেক কষ্ট। লা' ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হে আল্লাহ আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি দান কর।"

দিনের তখন তৃতীয় প্রহর শেষ হতে যাচ্ছে। মহানবী (সা) বার বার অচেতন হয়ে পড়ছেন। প্রতিবার চেতনা ফিরে আসার পরই তিনি বলছেন, "হে আল্লাহ, হে আমার পরম বন্ধু, হে আমার পরম সুহৃদ তোমার সঙ্গে তোমার সন্নিধানে!"

মহানবীর পরম স্নেহভাজন হযরত আলী (রা)-এর কোলে তখন মহানবীর মাথা। চোখ মেললেন মহানবী (সা) এবং আলীর দিকে তাকালেন। বললেন, "সাবধান, দাস-দাসীদের প্রতি নির্মম হয়ো না।'

মহানবীর চির বিদায়ের অন্তিম মুহূর্ত।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) মহানবীর মাথা কোলে নিয়ে বসে আছেন। তখন শেষবারের মত মহানবী (সা) চোখ খুললেন। উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নামাজ, নামাজ সাবধান! দাস-দাসীদের প্রতি সাবধান!' এবং মহানবীর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, 'হে আল্লাহ, হে আমার পরম সুহৃদ!'

এটাই ছিল রাহমাতুললিল আলামিনের শেষ নিঃশ্বাসের শেষ কথা।

মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে চির বিদায় ঘটল জগতের শেষ নবী, আশরাফুল আম্বিয়া, রাহমাতুললিল আলামিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইকরামা বিন আবু জাহ্ল পালাচ্ছে।
মহানবীর মক্কা বিজয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই সে মনে করল তার আর রক্ষা নেই।
মহানবী (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার অপরাধ সীমাহীন।
মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মহানবী (সা) মক্কাবাসীরা অস্ত্র হাতে না নিলে তাদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা ঘোষণা করেছিলেন। এ সময় ইকরামা মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে। দু'জন মুসলিম শহীদ হওয়া ছাড়াও আরও কয়েক ডজন লোক আহত হয় তার কারণে।
এছাড়া বদর, উহুদ, খন্দক ও মুসলমানদের আশ্রিত বানু খোজায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সে চরম বৈরিতা ও নৃশংসতা প্রদর্শন করেছে।
সুতরাং পালাচ্ছে সে।
জিদ্দার উপকূল থেকে নৌকা নিয়ে সে পালাচ্ছে আরব ভূমি থেকেই।
কিন্তু পার হতে পারল না সে লোহিত সাগর। প্রবল বাতাস তার নৌকা আবার ফিরিয়ে আনল জিদ্দা উপকূলে। শত চেষ্টা করেও সে রোধ করতে পারল না নৌকার পেছন গতি।
কূলের কাছাকাছি এসে দেখল তীর থেকে তার স্ত্রী উম্মে হাকিম তাকে কাপড় উড়িয়ে ডাকছে।
ইকরামা তীরে নামলে তার স্ত্রী তাকে বলল, 'আমি সেই মহানুভবের কাছ থেকে এসেছি যিনি সকল মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার বন্ধন মজবুতকারী। আমি তার নিকট থেকে তোমার নিরাপত্তা লাভ করেছি। তুমি রাসূলুল্লাহর কাছে চলো।'
ইকরামা তার স্ত্রীর সাথে হাজির হলো মহানবী (সা)-এর দরবারে।
আমৃত্যু বৈরী সেই আবু জাহ্লের পুত্র ইকরামা। এই ইকরামাও বৈরিতার কোন কিছুই বাদ রাখেনি।
সেই ইকরামা সমীপবর্তী হলেন মহানবীর। বেশ দূরে থাকতেই ইকরামাকে চিনতে পারলেন মহানবী (সা)। উৎসাহ আগ্রহে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি।
দ্বিধা, সংকোচ, ভয় সব মিলিয়ে পদক্ষেপগুলো জড়িয়ে পড়ছে ইকরামার। এগুতে যেন কষ্ট হচ্ছে তার।

উঠে দাঁড়িয়ে মহানবী (সা) দু'হাত বাড়িয়ে ছুটলেন ইকরামার দিকে। দ্রুততার কারণে তাঁর গায়ের চাদর খসে পড়ে গেল গা থেকে।

মহানবী (সা) জড়িয়ে ধরলেন ইকরামাকে। বললেন, 'খোশ আমদেদ, বিদেশী সওয়ার।'

ইকরামা তার স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'সে জানতে পেরেছে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।'

'সে সত্য বলেছে।' বললেন মহানবী (সা)। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইকরামার মুখ। লজ্জা-বেদনায় নুয়ে গেল ইকরামার মাথা। ভেজাকণ্ঠে বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আপনি তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। হে আল্লাহর রাসূল, এর আগে আমি ইসলাম-দুশমনির বহু প্রমাণ দিয়েছি। এখন আমার আশা, আজ পর্যন্ত আমি আপনার সাথে যে শত্রুতা করেছি, যত যুদ্ধে আপনার বিরুদ্ধে লড়েছি, হক পথে যত বাধা আরোপ করেছি, সেসব ক্ষমা করে দিন। আমার জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করুন।"

আল্লাহর রাসূল দু'হাত তুললেন। ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তিনি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে ইকরামার জন্যে।

আনন্দাশ্রুতে ভরে গেল ইকরামার দু'চোখ।

আরজ করলেন তিনি মহানবীকে, 'হে আল্লাহর রাসূল, এমন কিছু আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন যা আমি সবসময় আমল করতে পারি।'

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "খালিস অন্তরে (কথা ও কাজে) আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত বা একত্ব এবং আমার রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাকো।"

ইকরামা আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, আমি আজ পর্যন্ত যত সম্পদ দাওয়াতে হকের বাধা দানে ব্যয় করেছি, তার চেয়ে দ্বিগুণ এখন আমি আল্লাহর পথে ব্যয় করবো। যত লড়াই আমি হকের বিরুদ্ধে লড়েছি, এখন আল্লাহর পথে তার দ্বিগুণ জিহাদ করবো।"

আল্লাহর রাসূল (সা) আবার দোয়া করলেন ইকরামার জন্যে।

ইকরামা যখন মহানবীর কাছ থেকে ফিরছিলেন, তখন তার দু'গণ্ড বেয়ে নামছিল অবিরাম অশ্রুধারা। কি এক স্বর্গীয় নূরের আলোতে তাঁর মুখমণ্ডল দীপ্ত হয়ে উঠেছে। ইকরামার হলো নতুন জন্ম– নতুন এক ইকরামা তিনি।

ইসলাম গ্রহণের সময় ইকরামা বিন আবু জাহ্ল বলেছিলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে তিনি যত যুদ্ধ করেছেন, যত অর্থ খরচ করেছেন, তার দ্বিগুণ তিনি খরচ করবেন ইসলামের জন্যে।

আমৃত্যু কথাটা মনে রেখেছেন ইকরামা বিন আবু জাহ্ল।

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন ইকরামা। এ জন্যে গঠিত ১১টি বাহিনীর একটির সেনাপতি ছিলেন তিনি। ইয়ামামা থেকে জর্ডান, জর্ডান থেকে ইয়েমেন– এই বিস্তৃত অঞ্চলে তিনি যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর বাহিনীর গোটা খরচ তিনি নিজের অর্থ থেকে ব্যয় করেছেন, বায়তুল মাল থেকে তিনি এক পয়সাও নেননি।

ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষে আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বাধীন সিরিয়াগামী বাহিনীতে শামিল হলেন ইকরামা (রা) একজন সেনাধ্যক্ষ হিসেবে।

সিরিয়াগামী বাহিনী সমবেত হয়েছে মদীনার উপকণ্ঠে।

এ বাহিনীর পরিদর্শনে বেরিয়েছেন আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা)। এক তাঁবু তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো যার চারদিকে ঘোড়া আর ঘোড়ার মিছিল। আর দেখলেন, বর্শা, তরবারী এবং অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামের বিশাল স্তূপ সেখানে।

হযরত আবু বকর এলেন সে তাঁবুর কাছে। উঁকি দিলেন ভেতরে। দেখতে পেলেন ইকরামা (রা)-কে।

তিনি জানতে পারলেন, এসব ঘোড়া ও সরঞ্জাম ইকরামা নিজ অর্থে কিনেছেন যুদ্ধের জন্যে।

হযরত আবু বকর (রা) ইকরামাকে সালাম করলেন এবং বললেন, "ইকরামা তুমি এই যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্যে বিপুল অর্থ খরচ করেছো। আমি চাই, এর একটা অংশ বায়তুল মাল থেকে তুমি নাও।"

ইকরামা (রা) আরজ করলেন, "হে খলিফাতুর রাসূল, আমার নিকট এখনও দু'হাজার দিনার নগদ রয়েছে। আমার সম্পদ আমি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। বায়তুল মালের উপর বোঝা আরোপ করা থেকে আমাকে মাফ করুন।"

হযরত আবু বকর (রা) আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। দু'হাত তুলে তিনি দোয়া করলেন ইকরামার জন্যে।

'আজ আল্লাহর জন্যে জীবন বিলিয়ে দেবোনা?'

আজনাদাইনের যুদ্ধ শেষ।

দামেশ্‌ক বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে।

মুসলিম বাহিনী জর্দানের ফাহলে।

ছোট মুসলিম বাহিনী ৮০ হাজার রোমক সৈন্যের মুখোমুখি।

সম্মুখ সমরে ভীত রোমক বাহিনী বীরত্বের বদলে বেছে নিল ষড়যন্ত্রের পথ।

এক অন্ধকার রাত।

রোমক বাহিনী এসে আপতিত হলো মুসলিম বাহিনীর উপর।

ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো।

যুদ্ধ চলল সে রাত এবং পরের গোটা দিন। এক ইকরামা ইবনে আবু জাহেল যেন দশ ইকরামায় পরিণত হয়েছেন। যেদিকে তিনি ছুটছেন, লাশের সারি পড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের স্রোত তাকে মূল বাহিনী থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। সামনে তাঁর বিরাট এক শত্রু ব্যূহ।

ঢুকে পড়লেন তিনি সে শত্রু ব্যূহে।

তাঁর লক্ষ্য শত্রু নিধন। নিজের প্রতি কোন খেয়াল তাঁর নেই। আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল তাঁর দেহ। সাথীরা চিৎকার করে বলল, "ইকরামা আল্লাহর ভয় করো। এভাবে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করো না। আবেগকে বুদ্ধির উপর বিজয়ী হতে দিও না।"

ইকরামা তার তরবারী না থামিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "হে লোকেরা, আমি লাত-উজ্জার খাতিরে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতাম। আজ আল্লাহ ও রাসূলের (সা) জন্যে জীবন বিলিয়ে দেব না? আল্লাহর কসম, তা কখনো হবে না।"

রোমক সৈন্যেরা তখন পিছু হটতে শুরু করেছে। যুদ্ধে তাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটল। মাত্র কতিপয় সৈন্য ছাড়া গোটা রোমক বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়েছিল ঐ যুদ্ধে। শহীদ হতে চাইলেও এ যুদ্ধেও ইকরামা গাজী হয়ে ফিরলেন।

ইয়ারমুকের ভয়াবহ রণক্ষেত্র।

রোমক সম্রাটের ২ লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী অতুল সমর-সম্ভার নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত।

তাদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে ৪০ হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী।

দুই পক্ষ থেকেই শুরু হয়েছে মরণপণ যুদ্ধ। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বিশাল রোমক বাহিনীর চাপে মুসলিম বাহিনীর ব্যূহগুলো ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো।

খোদ সেনাপতির তাঁবু বিপন্ন হয়ে উঠল।

ইকরামা বিন আবু জাহলের হৃদয়ের সব আবেগ যেন উথলে উঠল। নিজের ঘোড়া হাঁকিয়ে অগ্রসর হলেন সামনে এবং উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, "হে রোমকরা, আমি কোন এক সময় স্বয়ং রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে (কুফরী অবস্থায়) লড়াই করেছি। আজ কি তোমাদের মুকাবিলায় আমার কদম পিছু হটতে পারে? আল্লাহর কসম, এমনটি কখনও হবে না।"

বলে তিনি পেছনে তাকিয়ে তাঁর বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন, "এসো, কে আমার হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করবে?"

চারজন অগ্রসর হলো তাঁর দিকে। তাঁরা ইকরামার হাতে হাত রেখে শাহাদাতের বাইয়াত গ্রহণ করল। এই চারজনের মধ্যে দু'জন ছিল ইকরামার দুই ছেলে।

তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল খালিদ ইবনে ওয়ালিদের তাঁবু লক্ষ্য করে এগিয়ে আসা রোমক সৈন্যদের উপর।

শুরু হলো তাদের মরণপণ লড়াই।

এক এক করে তারা শহীদ হলেন অথবা গুরুতর আহত হয়ে লড়াই করতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। গুরুতর আহত ছিলেন ইকরামার দুই পুত্র।

ছুটে এলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ।

নিহতের স্তূপে পাওয়া গেল হযরত ইকরামার (রা) লাশ। তাঁর নিঃশ্বাস তখনও ছিল। হযরত খালিদ তাঁর মাথা কোলে তুলে নিলেন। তাঁর মুখে ফোটা ফোটা পানি দিতে দিতে বললেন, "আল্লাহর কসম, ইবনে হানতামার (হযরত উমর ফারুকের) ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। তাঁর ধারণা ছিল যে, বনি মাখজুমীরা শাহাদাত লাভ করতে চায় না।"

একটি বক্তৃতা ও কাব্য প্রতিযোগিতা

মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধের পর আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মদীনায় প্রতিনিধিদল আসার হিড়িক পড়ে গেল। কেউ এল ইসলাম গ্রহণের জন্যে, কেউ এল মহানবীর সাথে দেখা করে সব বিষয় অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেবার লক্ষ্যে। আরবের একটি বড় ও প্রভাবশালী গোত্র বনু তামিম। সে গোত্র থেকে প্রায় ৮০ জনের একটি প্রতিনিধিদল এল মদীনায়।

বনু তামিমের যেমন অর্থ-বিত্ত আছে, তেমনি ভাষা ও কবিত্বের প্রতিভা নিয়ে তারা দারুণ অহংকারী। এ ব্যাপারে গোটা আরবের কাউকেই তারা পাত্তা দেয় না। তারা মনে করে ভাষা ও কবিত্বের প্রতিযোগিতায় তাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

মহানবীর (সা) সাথে আলোচনায় বসার পর তারা মহানবীর (সা) কাছে প্রস্তাব করল, আপনাদের সাথে প্রথমে আমাদের কীর্তিগাথা নিয়ে কাব্য প্রতিযোগিতা হবে। যদি তাতে আপনারা জিতে যান, তাহলে ইসলাম নিয়ে কথা বলব।

উত্তরে মহানবী (সা) বললেন, গর্ব-অহংকার প্রদর্শন এবং কবিতাবাজির জন্যে আমি প্রেরিত হইনি। তবে তোমরা যদি পীড়াপীড়ি কর, তাহলে শুন, এক্ষেত্রেও আমরা দুর্বল ও অসমর্থ নই।

শুরু হলো বক্তৃতা ও কাব্য প্রতিযোগিতা। বনু তামিমের পক্ষ থেকে দাঁড়ালেন তাদের শ্রেষ্ঠ ভাষাশিল্পী ও বাগ্মী আতারফ বিন হাজিব। তিনি তার স্বগোত্রের মান-মর্যাদা, ক্ষমতা-প্রভাব, বংশ-গৌরব, বিত্ত-বৈভব, বীরত্ব ও মেহমানদারী নিয়ে অলঙ্কৃত ভাষায় ওজস্বী বক্তৃতা দিয়ে বিজয়ের গর্ব নিয়ে বসে পড়লেন।

তিনি বসলে মহানবী (সা) তাঁর সাহাবী সাবিত বিন কায়েসকে আতারফের জবাব দিতে নির্দেশ দিলেন।

সাবিত বিন কায়েস দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন, রিসালাত ও দাওয়াতে হকের বর্ণনা, আল-কুরআনের অবতীর্ণ হওয়া এবং মুহাজির ও আনসারদের চরিত্র ও কাজ এমন অলংকারপূর্ণ ভাষায় বাগ্মিতার সাথে বর্ণনা করলেন যে, গোটা মজলিস মন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চুপ হয়ে গেল।

বক্তৃতা প্রতিযোগিতার পর শুরু হলো কাব্য প্রতিযোগিতা।

বনু তামিমের পক্ষ থেকে দাঁড়ালেন তাদের শ্রেষ্ঠ কবি যবরকান বিন বদর। তিনি তাঁর গোত্রের আকাশস্পর্শী প্রশংসা-সম্বলিত কবিতা পাঠ করলেন।

যবরকান বসলে মহানবী (সা) সাহাবী কবি হাসসান বিন সাবিতকে জবাব দেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াতে বললেন।

হাসসান বিন সাবিত উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং দাওয়াতে হক-এর উপর এমন ছন্দোবদ্ধ এবং মাধুর্যপূর্ণ ও প্রভাবশালী কবিতা পাঠ করলেন যে, যবরকানের কবিতা ম্লান হয়ে গেল।

শেষ হলো প্রতিযোগিতা।

গোটা মজলিস তখন নীরব-নিস্তব্ধ।

উঠে দাঁড়াল বনু তামিম-এর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। উচ্চকণ্ঠে বললেন তিনি,

"পিতার কসম! মুহাম্মাদের (সা) খতিব আমাদের খতিব থেকে আফজাল এবং তাঁর কবি আমাদের কবি থেকে উত্তম। তাঁদের কণ্ঠস্বর আমাদের কণ্ঠস্বর থেকে চিত্তাকর্ষক ও মিষ্টি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদাতের যোগ্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

এই ব্যক্তি কিরাসুল আকরা তামিমী। তিনি বনু তামিম-এর নেতা।

কিরাসুল আকরা থামতেই বনু তামিম প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য একবাক্যে বলে উঠলেন, "আপনি সত্য বলেছেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন।"

অতঃপর বনু তামিমের সকলে মহানবীর হাতে হাত রেখে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন।

হযরত উমর (রা)-এর কঠোর সিদ্ধান্ত

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকাল। দুই সাহাবী আকরা বিন হারিস এবং আইনিয়া বিন হাসান আবু বকরের দরবারে হাজির হলেন।

মহানবী (সা) তালিফে কুলূব হিসেবে যাদের সাহায্য করতেন, আকরা তাদের একজন। তারা খলিফা আবু বকরের কাছে 'জায়গীর'-এর আবেদন জানালেন।

আবু বকরের দরবারে তখন উমর ফারুক (রা) হাজির ছিলেন। তিনি আকরা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে তালিফে কুলূব করতেন। এখন তোমার পরিশ্রম করা উচিত।"

আবু বকর (রা) রাসূল (সা)-এর আমলের সকল দান ও উপঢৌকন বহাল রাখেন এবং আকরা ও আইনিয়া হাসানের আবেদন অনুসারে তাদের জমি বরাদ্দের লিখিত নির্দেশ দিলেন।

এর অনেক পরের ঘটনা।

তখন উমর ফারুক (রা)-এর শাসনকাল।

আকরা (রা) এবং আইনিয়া হাসান এলেন তাঁর কাছে এবং আবেদন করলেন আবু বকর (রা) কর্তৃক নির্দেশ বহাল রাখার জন্যে।

উমর (রা) তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, "আল্লাহ ইসলামের বিজয় দিয়েছেন এবং তোমাদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করেছেন। এখন তোমরা (জায়গীর ও উপঢৌকন ছাড়া) ইসলামের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে যাও। নচেৎ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে তরবারিই ফায়সালা করবে।"

উমর (রা)-এর এই সিদ্ধান্ত কঠোর হলেও তার মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়াই হলো না। আকরা (রা) হাসিমুখে ও আন্তরিকতার সাথে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। অতঃপর জিহাদের ময়দান হলো আকরা (রা)-এর স্থান। যুদ্ধরত অবস্থায়ই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

উপযুক্ত খাজনা আদায়কারী

তখন নবম হিজরী সাল।

মহানবী বিভিন্ন অঞ্চলে যাকাত ও খারাজ আদায়কারী নিয়োগ করছেন। যারা গোত্রে গোত্রে ঘুরে যাকাত ও খারাজ আদায় করে মহানবীর বাইতুলমালে জমা দেবেন।

যাকাত ও খারাজ আদায়কারী নিয়োগের লক্ষ্যে মহানবী (সা) ডেকে পাঠালেন খাজরাজ গোত্রের বনু সালেমের নব্য যুবক উবাদাহ্ বিন সামিতকে।

দীর্ঘদেহী ও দোহারা গড়নের উবাদাহ্ হাজির হলেন মহানবীর দরবারে।

মহানবী (সা) তাঁকে পদ ও দায়িত্বের কথা বুঝিয়ে বললেন, "নিজের দায়িত্ব পালন-কালে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। কিয়ামতের দিন কোন চতুষ্পদ জন্তুও যেন তোমার বিরুদ্ধে কোন ফরিয়াদ নিয়ে না আসে।"

শুনে হযরত উবাদাহ্ (রা) বিন সামিত কেঁদে ফেললেন। বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোন। আল্লাহ্‌র কসম, দু'জন মানুষের শাসক বা রাজস্ব আদায়কারী হওয়ারও ইচ্ছা আমার নেই।"

কেউ কোন পদ চাইলে রাসূলুল্লাহ্ সেই পদ তাকে দিতেন না।

উবাদাহ্‌র কথায় তিনি খুশী হলেন। এই পদের জন্যে তাকেই উপযুক্ত মনে করলেন।

আবু আকিল লাবিদ (রা) বিন রাবিয়াহ্ আমেরী আরবের জাহেলী যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। সেই যুগেও সবচেয়ে সম্মানিত কা'বাঘরে যে সাত কবির কবিতা টাঙ্গিয়ে রাখা হতো, তাদের একজন কবি লাবিদ।

কবি লাবিদের কয়েকটি কবিতা মহানবী (সা) খুবই পছন্দ করতেন। সেগুলোর মধ্যে জাহেলী যুগের লিখা হলেও একটা পংক্তি ছিল তাঁর খুবই পছন্দ। যার অনুবাদ– "সতর্ক থেকো, আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।" স্বয়ং মহানবীর উক্তি : কবিদের কবিতার মধ্যে লাবিদের এই কবিতা খুবই ভালো।

সেই কবি লাবিদ বদলে গেল ইসলাম গ্রহণের পর। ৯ম হিজরী সালে ১১৩ বছর বয়সে মদীনায় এসে মহানবীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি।

ইসলাম গ্রহণের পর আরও ৩২ বছর জীবিত ছিলেন কবি লাবিদ। এই দীর্ঘ সময়ে একটি অথবা দু'টি কবিতা লিখেন তিনি।

তখন খলিফা উমর ফারুকের খিলাফতের সময়।

খলিফা একদিন কবি লাবিদকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, 'ইসলামী যুগে তিনি কোন্ কবিতা রচনা করেছেন।'

কবি লাবিদ উত্তরে তাঁকে জানালেন, 'কবিতার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাঁকে সূরা বাকারাহ্ এবং সূরা আলে-ইমরান প্রদান করেছেন।'

অর্থাৎ অপরূপ আল-কুরআন পাবার পর তিনি আর কবিতা রচনার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

ইসলাম-পূর্ব জাহেলী যুগ।

মদীনার ছয় যুবক হজ্বে এসেছেন। তখন মদীনার নাম ছিল ইয়াসরিব।

সে যুগেও হজ্ব হতো, কিন্তু জাহেলী রীতি অনুসারে।

মক্কার আকাবা নামক স্থানে তাঁবু গাড়লেন মদীনার সেই যুবকরা।

এই ছয়জন যুবক একদিন গভীর আলোচনায় মশগুল, একজন অতিথি এলেন তাঁবুর দরজায়।

শ্রদ্ধা জাগানো সুন্দর সৌম্য-দর্শন এক অতিথি।

অতিথি সালাম দিলেন যুবকদের উদ্দেশ্যে। তারপর বললেন, 'আপনারা কি আমার কথা শুনবেন?'

মিষ্টি কণ্ঠস্বর অতিথির।

যুবকরা সমস্বরে বলে উঠলো, 'অবশ্যই অবশ্যই।'

অতিথি ব্যক্তিটি ছিলেন মহানবী (সা)।

তিনি তখন ছয় যুবককে মানুষের জন্যে রাব্বুল আলামিনের খোশখবর শোনালেন, তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণের উৎসাহ দিলেন এবং বললেন, 'আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহর বান্দাদের পথ প্রদর্শনে নিয়োজিত রয়েছি।'

ছয়জন যুবকই মহানবীর কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। আল্লাহর রাসূলের কথা শেষ হতেই তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর যে কালাম আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা থেকে আমাদের কিছু শোনান।'

মহানবীর পবিত্র কণ্ঠে সূরা ইবরাহিম পাঠ হতে লাগলো। কয়েকটি আয়াত পাঠ হতেই চমৎকৃত হয়ে গেলেন ছয় যুবক। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "আল্লাহর কসম, এতো সেই নবী যাঁর উল্লেখ সবসময় আমাদের শহরের ইহুদীদের মুখে শোনা যায়। ইসলাম গ্রহণে ইহুদীদের আগে তাদেরই অগ্রসর হওয়া উচিত।"

অতঃপর তারা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মহানবী (সা)-কে আরজ করলো, 'হে মুহাম্মাদ (সা), আমরা আপনার দাওয়াত মনে-প্রাণে গ্রহণ করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক আপনি তাঁর রাসূল।'

এই ঘোষণা দেয়ার পর ছয়জনের মধ্য থেকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সুদর্শন যুবক আবু উসামা আসয়াদ বিন যুরারাহ মহানবীর দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার হাত সম্প্রসারিত করুন। আমি এই হাতে ইসলামের বাইয়াত করছি।'

মহানবী (সা) সানন্দে তাঁর হাত এগিয়ে দিলেন।

প্রথম বাইয়াত করলেন আসয়াদ বিন যুরারাহ। তারপর তাঁর সাথী পাঁচজন যুবক।

তাঁরা হলেন মদীনার প্রথম মুসলমান।

এইভাবেই এই উদ্যমী যুবকদের মাধ্যমে ইসলামের আলো প্রথম প্রবেশ করে ইয়াসরিব বা মদীনায়।

মদীনায় ইসলামের আলো প্রবেশের পর মহানবীর পক্ষ থেকে সেখানে মুসআব ইবনে উমায়েরকে পাঠানো হলো ইসলামের শিক্ষক হিসেবে।

মুসআব শিক্ষাদান ও ইসলামের দাওয়াতের কাজে নিজকে উৎসর্গ করলেন।

একদিন তিনি মদীনার বনি জাফর ও বনি আশহাল-এর পল্লীতে গেলেন। তার সাথে ছিলেন বিখ্যাত খাজরাজ গোত্রের বনু নাজ্জারের বিখ্যাত ব্যক্তি আসয়াদ ইবনে যুরারাহ।

তারা দু'জন বনু জাফরের একটা কূপের উপর গিয়ে বসলেন।

বনু আশহালের সরদার সা'আদ বিন মায়াজকে কেউ গিয়ে কথাটা লাগিয়ে দিলো যে, মুসলমানরা মহল্লায় এসে মানুষকে প্ররোচিত করছে।

কথাটা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে যাত্রা করলেন সেই কূপের দিকে।

পথিমধ্যে তিনি খবর পেলেন, মুসআবের সাথে তার খালাতো ভাই আসয়াদ ইবনে যুরারাহ রয়েছেন। থমকে গেলেন তিনি। তাঁর চাচাতো ভাই উসায়েদ বিন হুজায়েরকে বললেন, আসয়াদ না থাকলে আমিই যেতাম। তুমি গিয়ে ওদের বলে এসো, মানুষকে নষ্ট করার জন্যে ওরা আমাদের মহল্লায় যেন আর না আসে।

উসায়েদ দুরন্ত এক সাহসী যুবক।

ভয়াবহ এক বর্শা নিয়ে ছুটলেন বনু জাফরের সেই কূপের উদ্দেশ্যে।

উসায়েদকে এইভাবে আসতে দেখে আসয়াদ ইবনে যুরারাহ মুসআবকে বললেন, 'এই উসায়েদ আওস গোত্রের দুই প্রধানের একজন। তার কাছে আপনাকে উপযুক্ত দাওয়াত পৌছাতে হবে।'

'তাকে একটু বসতে দাও, আমি কথা বলবো।' বললেন মুসআব।

উসায়েদ এসেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মুসআবকে বলতে শুরু করলো, 'তুমি এসেছো দুর্বল লোকদের বোকা বানাবার জন্যে। জীবনের মায়া থাকলে এখনি চলে যাও। আর এদিকে আসবে না।'

মুসআব উসায়েদের কর্কশ ও দ্রুতকণ্ঠের জবাবে নরম ও মমতাভরা কণ্ঠে বললেন, 'প্রিয় ভাই, আমার কথা শুনুন। পছন্দ হলে গ্রহণ করবেন, না হয় বর্জন করবেন।'

মুসআবের নরম ও মমতাভরা কণ্ঠে উসায়েদের রাগ অনেকখানি পড়ে গেলো। বললো, 'তুমি যুক্তির কথা বলেছো। কি বলতে চাও বলো।'

মুসআব অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে ইসলামের মূল শিক্ষা তুলে ধরলেন এবং পাঠ করলেন আল-কুরআনের কিছু আয়াত।

উসায়েদের রাগ তখন পড়ে গেছে।

শান্ত হয়েছে সে।

মুসআব থামতেই উসায়েদের মুগ্ধ কণ্ঠ বলে উঠলো, "এসব কতই না ভালো জীবনের কথা। কতই না সুন্দর কালাম ওগুলো। তোমাদের ধর্মে প্রবেশের জন্যে কি করতে হয়?"

মুসআব ও আসয়াদ খুশী হয়ে তাকে জানালেন ইসলাম গ্রহণের জন্যে কি করতে হয়।

গোসল করে পবিত্র কাপড় পরে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলো উসায়েদ।

ফিরে যাবার সময় উসায়েদ মুসআবকে বললেন, আমি গিয়ে কৌশলে সা'আদ বিন মায়াজকে পাঠাচ্ছি।

উসায়েদকে পাঠিয়ে তার ফেরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সা'দ বিন মায়াজ।

উসায়েদ ফিরলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সা'আদ বললেন, 'তোমাকে অন্য রকমের দেখাচ্ছে। বল কি করে এলে?'

উসায়েদ বললেন, তাদের কথা শুনলাম, ভয়ের কিছুই পেলাম না।

বলে একটু থেমে আবার শুরু করলেন, 'একটা কথা শুনে এলাম, বনি হারেছার লোকেরা নাকি আসয়াদ ইবনে যুরারাকে হত্যা করার জন্যে বের হয়েছে। আপনার খালাত ভাইকে হত্যা করে আপনার বেইজ্জতি করাই তাদের লক্ষ্য।'

শুনে সা'আদ রেগে আগুন হয়ে গেলে। বর্শা হাতে ছুটলেন বনি জাফরের সেই কূপের দিকে।

কূপের নিকটবর্তী হয়ে আসয়াদ বিন যুরারাহ মুসআবকে জানালেন, 'যিনি আসছেন সেই সা'আদ বিন মায়াজ তার গোত্রের শীর্ষ ব্যক্তি। তিনি ইসলামে দাখিল হলে গোটা গোত্র তাকে অনুসরণ করবে।'

সা'আদ ইবনে মায়াজ কূপের ধারে এলেন। বনি হারেছার কাউকে কোথাও দেখলেন না। আর নিশ্চিন্ত বসে থাকতে দেখলেন আসয়াদকে। উসায়েদের কথাকে এখন তাঁর এক চাল বলে মনে হলো। ক্রুদ্ধ হলেন তিনি। বললেন তিনি আসয়াদকে, "আবু উসামা, আল্লাহর কসম, তোমার মাঝে আমার আত্মীয়ের সম্পর্ক না থাকলে তুমি কিছুতেই আমার মহল্লায় খারাপ কথা ছড়াবার সাহস পেতে না।"

আসয়াদ (রা) সা'আদ বিন মায়াজের মত ক্রুদ্ধ হলেন না। মিষ্টি হাসলেন শুধু। কোন কথা বললেন না। কথা বললেন মুসআব। মধুর কণ্ঠে সা'আদকে লক্ষ্য করে বললেন, 'প্রিয় ভাই, আপনি আমাদের কথা একটু শুনুন। আপনার খারাপ মনে হবে এমন কথা বলবো না। পছন্দ না হলে আমরা চলে যাব।'

সা'আদ বিন মায়াজ বললেন, 'বড় কায়দা করে কথাগুলো বললে।'

বলে সা'আদ বর্শা মাটিতে গেড়ে বসে পড়লেন। বুঝা গেল শুনতে চান তিনি।

মুসআব হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দিলেন এবং সূরা যুখরুফ বা হামিম থেকে কিছু আয়াত পড়ে শোনালেন।

পবিত্র কুরআনের পাঠ শুরু হতেই সা'আদ এর কঠিন মুখ সহজ হয়ে এল, ভরে গেল হাসি-খুশীতে।

মুসআব কুরআন তেলাওয়াত শেষ করতেই উসায়েদ যা বলেছিল, সা'আদও তাই বললেন। জানতে চাইলেন ইসলাম গ্রহণের নিয়ম-কানুন।

ঠিক উসায়েদের মতই সা'আদ ইবনে মায়াজ গোসল করে পবিত্র কাপড় পরে কালেমা পাঠ করে ইসলামে দাখিল হয়ে গেলেন।

সা'আদ বিন মায়াজ ইসলাম গ্রহণের সাথে গোটা বনু আশহাল গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল।

তখন উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকাল।

উবাদাহ্ বিন সামিত তখন ফিলিস্তিনীদের কাজী। আর মুয়াবিয়া (রা) সেই ফিলিস্তিনের গভর্নর।

উবাদাহ (রা) অন্যায়-অসংগতি তা যত ছোটই হোক, তার কাছে নতি শিকার করতো না।

এই উবাদাহ (রা)-এর সাথে একদিন কথা কাটাকাটি হয়ে গেল মুয়াবিয়ার (রা)। গভর্নর মুয়াবিয়া তাকে কিছু কঠোর কথা শোনালেন।

হযরত উবাদা (রা) তা সহ্য করলেন না। ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে এলেন মদীনায়। আসার সময় মুয়াবিয়া (রা)-কে বললেন, 'ভবিষ্যতে আপনি যেখানে থাকবেন, আমি সেখানে থাকবো না।'

মদীনায় ফিরে এলে খলিফা উমর (রা) তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন সব কথা উবাদাহ (রা)।

সব শোনার পর খলিফা উমর (রা) বললেন, "আমি আপনাকে কোনক্রমেই সেখান থেকে সরিয়ে আনবো না। দুনিয়াটা আপনাদের মত বুজুর্গের কারণেই টিকে আছে। যেখানে আপনাদের মত লোক থাকবে না, আল্লাহ সেই জমিনকে খারাপ ও ধ্বংস করে দেবেন। আপনি আপনার স্থানে ফিরে যান। আমি আপনাকে মুয়াবিয়ার (রা) অধীনতা থেকে পৃথক করে দিলাম।"

খলিফা উমর (রা) অনুরূপভাবে গভর্নর মুয়াবিয়াকেও লিখে পাঠালেন।

তখন উসমান (রা)-এর খিলাফত। মুয়াবিয়া (রা) তখন সমগ্র সিরিয়ার গভর্নর। উবাদাহ্ ইবনে সামিত তাঁর অধীনে একজন শাসক। উবাদাহ্ (রা) সেই লোক যিনি সত্য কথা, উচিত কথা যখন বলেন, তখন কোথায় কার কাছে বলছেন তার পরোয়া করেন না।

তাঁর বিরোধ বাধল মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে। মুয়াবিয়া (রা) খলিফা উসমান (রা) কে লিখলেন, "উবাদাহ্ বিন সামিতের কথা ও ভাষণ জনগণকে উত্তেজিত করে এবং বিশৃংখল করে তোলে। তাঁকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নিন। তা না হলে আমি সিরিয়ার শাসন কাজ পরিত্যাগ করব।"

উসমান (রা) উবাদাহ্ ইবনে সামিতকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন।

তিনি এলেন খলিফা উসমান (রা)-এর দরবারে। দরবারে তখন অনেক লোক। উবাদাহ্ (রা) এক কোনায় চুপ করে বসে পড়লেন। উবাদাহ্ (রা)-কে দেখতে পেয়েই উসমান (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলুন তো কি ঘটনা।"

স্পষ্টবাদী উবাদাহ্ (রা) উঠে দাঁড়ালেন। সত্য প্রকাশের অসীম আবেগে তিনি উদ্দীপ্ত। দরবারের সমাবেশকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "হে মানুষেরা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার পর আমীরেরা সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ-এ পরিবর্তন করবে। অবৈধ কাজকে বৈধ মনে করতে থাকবে। কিন্তু গুনাহর কাজে কারও আনুগত্য জায়েয নয়। তোমরা অবশ্যই অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকবে।'

আবু হুরাইরা (রা) উবাদাহ্ (রা)-এর বক্তব্যে কিছু বাধা দিতে চাইলেন।

উবাদাহ্ ইবনে সামিত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "আমরা যে সময় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত (নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে বাইয়াতে আকাবায় এই বাইয়াত সংঘটিত হয়) করেছিলাম, তখন আপনি সেখানে ছিলেন না। আমাদের বাইয়াতের শর্ত ছিল যে, লোকদের কাছে ভাল কথা পৌছাতে থাকবো, খারাপ কথা থেকে বিরত রাখবো। কখনো কারো ভয়ে ভীত হবো না।...

এই বাইয়াত মহানবীর সাথে হয়েছিল। ওয়াদা পূরণ আমাদের অবশ্যকর্তব্য কাজ।"

উবাদার (রা) এই কথার পর কারও কোন কথা আর থাকতে পারে না। আর কেউ কোন কথা বলতে সাহস করলো না।

জাবির ইবন আবদুল্লাহ নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে যে ৭৫ জন মদিনাবাসী মিনার এক গোপন অবস্থানে মহানবীর হাতে শপথ নিয়েছিলেন তাঁদেরই একজন।

তিনি মহানবীর সাথে প্রধান সব যুদ্ধ ও অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন।

মহানবী (সা)-এর মৃত্যুর পর শোকের দুর্বহ ভার নিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন কুরআন পাঠ এবং কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদান কাজে।

মহানবীর একটা হাদীসের মূল্য তাঁর কাছে ছিল তাঁর সবকিছুর চেয়ে বেশী মূল্যবান।

একবার তিনি খবর পেলেন 'কিসাস' বা বদলা সম্পর্কিত একটি হাদীস রয়েছে আবদুল্লাহ বিন আনিসের কাছে এবং তিনি বাস করছেন সিরিয়ায়।

খবর পেয়েই জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সিরিয়ায় যাওয়ার জন্যে একটি উট কিনলেন এবং সিরিয়া যাত্রা করলেন সেই হাদীসটি শোনার জন্যে।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি পৌছলেন সিরিয়ায়। আবদুল্লাহ ইবনে আনিসের বাড়ীতে। আব্দুল্লাহ ইবনে আনিসের কাছে খবর পাঠালেন যে, মদীনা থেকে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছে।

নাম শুনেই চমকে উঠলেন আবদুল্লাহ বিন আনিস। বললেন, কোন জাবির, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ?

বলেই তড়িঘড়ি এমন অবস্থার মধ্যে বাড়ী থেকে বের হলেন যে, তার গা থেকে চাদর পড়ে গিয়ে পায়ের তলায় মথিত হতে লাগল। কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

তিনি গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আবদুল্লাহ ইবনে জাবিরকে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিয়ে।

জাবির বললেন, আমি শুনলাম আপনার কাছে 'কিসাস' সংক্রান্ত একটা হাদীস রয়েছে। আমি এসেছি সে হাদীস শুনতে। বলুন সে হাদীসটি।

আবদুল্লাহ বিন আনিস বর্ণনা করলেন, "আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন। সবাই উলংগ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় থাকবে এবং বুহম হবে ('বুহম' অর্থ কারও কিছুই থাকবে না)। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ডেকে বলবেন, 'আমি বদলা দেব, আমিই মালিক। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক জান্নাতীকে প্রত্যেক দোজখী থেকে এবং প্রত্যেক দোজখী থেকে প্রত্যেক জান্নাতীকে হক আদায় করে না দেব, ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে জান্নাতে অথবা দোজখে নিক্ষেপ করবো না। এমনকি একটি সাধারণ থাপ্পড়ের কিসাস বা বদলাও আদায় করে দেব। এই বদলা কিভাবে দেয়া হবে আমরা তো সবাই তখন শূন্য হাতে থাকব? এই প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সা) বললেন, "নেকি ও বদী দিয়ে ফায়সালা করা হবে।"

এই হাদীস শুনে নেয়ার পর জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আবার মদীনা যাত্রা করলেন।

মদীনায় নিজ বাড়ীতে মৃত্যুর মুখে উবাদাহ্ বিন সামিত।

অসহনীয় রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে দর্শনার্থীদের সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলছেন, "আল্লাহ্‌র ফজিলতে ভাল আছি।"

শেষ মুহূর্ত যখন আসন্ন তখন উবাদাহ্ (রা) তাঁর গোলাম-খাদেম প্রতিবেশী এবং যাদের সাথে সব সময় উঠা-বসা করেছেন সেই পরিচিতজনদের তিনি ডেকে আনতে বললেন।

সবাইকে ডেকে আনা হলো।

সবাই উপস্থিত হলে তাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "সম্ভবত এটাই আমার শেষ দিন এবং আজকের রাত আমার আখিরাতের প্রথম রাত হতে পারে। তোমাদের সাথে আমি যদি আমার মুখ দিয়ে অথবা হাত দিয়ে কঠিন আচরণ করে থাকি, তাহলে আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার আগেই একে একে তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আমার থেকে প্রতিশোধ নেবেন।"

লোকেরা আরজ করল, "আপনি আমাদের পিতৃতুল্য এবং আমাদেরকে আদব ও শিষ্টাচার শিখিয়েছেন।"

উবাদাহ্ (রা) বললেন, "তোমরা কি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ?"

সবাই বলল, "হ্যাঁ, ক্ষমা করে দিয়েছি।"

উবাদাহ্ (রা) বললেন, "হে আমার আল্লাহ্, সাক্ষী থেকো।"

অন্তিম মুহূর্তে তাঁর ছেলে এসে আরজ করল, "আমাকে কিছু ওসিয়ত করুন।"

পুত্রকে শেষ-উপদেশে বললেন তিনি, "তাকদীরের উপর ইয়াকিন রেখো। তা না হলে ঈমানের জন্যে উপযুক্ত হতে পারবে না।"

বনি মুসতালিকের যুদ্ধ শেষ।
মহানবী (সা)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরছে।
কি এক ঘটনায় একজন মুহাজিরের সাথে একজন আনসারের বিরোধ বাধল। বলা হলো, একজন মুহাজির লাথি মেরেছে একজন আনসারকে।
এ নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যে একটা শোরগোল সৃষ্টি হলো।
মহানবী (সা)-এর কানে এলো বিষয়টা। তিনি তাদের ডেকে বললেন, 'এ তো জাহেলী যুগের আওয়াজের মত শোনাচ্ছে। এসব অশোভন কথাবার্তা পরিত্যাগ কর।'
বিষয়টা এখানেই মিটে গেল।
মুসলিম বাহিনীর সাথে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল। তার ছেলেও ছিল। সে মুনাফিক নয়।
ঘটনাটা মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর কানেও গেল। মুহাজির ও আনসার মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির একটা বড় সুযোগ বলে একে সে মনে করল।
সে নেচে উঠল। বলল, কি! একজন মুহাজির এই কাজ করেছে? ঠিক আছে মদীনায় একবার পৌছতে দাও। সম্মানী লোকেরা মদীনাবাসী নীচু সম্প্রদায়ের (মক্কাবাসী) লোকদের মদীনা থেকে বের করে দেবে।'
আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর ষড়যন্ত্রের কথা উমর (রা)-এর কানে গেল। উমর (রা) মহানবী (সা)-এর কাছে গিয়ে আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি অনুমতি দিলে ঐ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিতে পারি।"
মহানবী (সা) বললেন, 'না। মানুষ বলবে যে, আমি নিজের লোকদের হত্যা করে থাকি।'
মহানবীর কথায় উমর (রা) চুপ করে গেলেন।
আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর ছেলে কিন্তু চুপ করে থাকলেন না। পিতার ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ আবদুল্লাহ (রা) তার পিতাকে গিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে মদীনা প্রবেশ করতে দেব না, যে পর্যন্ত না আপনি নিজ মুখে সাক্ষ্য দেন যে, আপনি নীচ লোক, আর রাসূলুল্লাহ সম্মানিত।"
অবস্থা বেগতিক দেখে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই পুত্র যেভাবে বলেছে সেইভাবে সাক্ষ্য দিল।

সাহাবী বারা (রা) বিনা মা'রুর পুত্র বশর বিন বারা।

প্রাণবন্ত এক নবীন যুবক সে।

ইসলামের যুগ-সন্ধিক্ষণের ঘটনা। আকাবায় শপথ গ্রহণকারীদের একজন তিনি। বদর, উহুদ ও খন্দকের লড়াই-এরও তিনি এক যোদ্ধা।

খাইবার যুদ্ধের পর এক ঘটনায় তিনি মহনবীর প্রতি আদব প্রকাশে এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

এক ইহুদীনির দাওয়াত গ্রহণ করেছেন মহানবী (সা)। সাহাবীদের নিয়ে তিনি খেতে বসেছেন।

সাহাবীদের মধ্যে বশর বিন বারা রয়েছেন। খাওয়া শুরু করেছেন তিনি।

গোশতের সাথে বিষ মেশানো আছে বুঝতে পেরেই মহানবী (সা) খেতে নিষেধ করলেন সবাইকে।

কিন্তু বশর বিন বারা বিষযুক্ত গোশতের টুকরা গিলে ফেলেছেন।

গোশতের টুকরো মুখে দিয়ে গোশতের স্বাদ থেকে বারাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, গোশতে কিছু ঘটেছে। মনে হলো, গোশতের টুকরো তিনি উগরে ফেলেন। কিন্তু দস্তরখানায় মহানবীর সামনে এইভাবে উগরে ফেলাকে বেআদবী মনে করলেন এবং গিলে ফেললেন গোশতের টুকরা।

এই গোশতের বিষক্রিয়াতেই বশর বিন বারা ইন্তিকাল করেন।

আনাস বিন মালিক মহানবীর ফায়-ফরমাশ শোনে।

মহানবী (সা) হিজরত করে মদীনা আসার পর পরই আনাসের মা উম্মে সুলাইম ১০ বছরের আনাসকে মহানবীর কাছে পেশ করে বলেন, আমার এ কলিজার টুকরা আপনার খেদমতে হাজির থাকবে, আপনার ফায়-ফরমাশ শুনবে। আপনি তাকে গ্রহণ করুন।

তারপর থেকে রাত এবং মধ্যদিনের একটা অংশ বাড়িতে কাটানো ছাড়া ফজরের পূর্ব থেকে গোটা সময় আনাস কাটিয়েছেন মহানবীর খেদমতে। অনেক কথা ও কাহিনীর আকর ছিলেন এই আনাস ইবনে মালিক (রা)।

একদিনের কথা।

মহানবী (সা) কোন কাজের নির্দেশ দিলেন আনাসকে। আনাস আদেশ তামিলের জন্যে বেরিয়ে গেল। পথে একদল ছেলেকে খেলতে দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল এবং খেলা দেখতে লাগল। মহানবীর আদেশের কথা বেমালুম ভুলে গেল সে।

অনেক দেরী দেখে আনাসের খোঁজে বেরুলেন মহানবী (সা) নিজে। খেলা দেখায় মশগুল আনাসকে দেখতে পেলেন তিনি।

আল্লাহর রাসূলকে দেখে আনাসের মনে পড়ে গেল আল্লাহর রাসূলের আদেশের কথা। কিন্তু ভয় পেয়ে পালানোর মত বেয়াদবী করল না আনাস। লজ্জিত হয়ে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকল।

মহানবী (সা) এসে স্নেহের সাথে আনাসের হাত হাতে নিলেন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর আদেশের কথা।

আনাস ছুটল তার কাজ নিয়ে। মহানবী (সা) যতক্ষণ আনাস না ফিরল, ততক্ষণ কাছেই একটা দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেন।

আনাস (রা) বলেন, "আমি দশ বছর তাঁর খেদমত করেছি। কিন্তু নবী (সা) আমার উপর কোন সময় অসন্তুষ্ট হননি এবং আমার উপর কোন দাপটও দেখাননি। এমনকি কোন সময় এমন কথাও বলেনি যে, অমুক কাজ কেন করেছ বা অমুক কাজ কেন করনি।"

মদীনার খাজরাজ গোত্রের পল্লী।

বনু নাজ্জারদের একটি বাড়ী।

আনাস (রা) ইবনে মালিকের সৎ-পিতা আবু তালহা আনাসের মাকে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল (সা) আজ অভুক্ত আছেন। কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা কর।

সঙ্গে সঙ্গেই উম্মে সুলাইম আনাসকে পাঠালেন।

আনাস পৌঁছলেন।

মহানবী (সা) তখন মসজিদে নববীতে বসেছিলেন। আনাসকে দেখেই আল্লাহর রাসূল (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবু তালহা তোমাকে পাঠিয়েছেন?'

'জি আল্লাহর রাসূল!' বলল আনাস। 'খাওয়ার জন্যে?' আবার জিজ্ঞাসা করলেন মহানবী (সা)।

'জি, হ্যাঁ', উত্তর দিল আনাস।

মহানবী (সা) উপস্থিত সাহাবীদের নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সকলকে নিয়ে এলেন আবু তালহার বাড়ীতে।

মহা খুশী হলেন আবু তালহা। কিন্তু ভীষণ চিন্তায় পড়লেন তিনি। যেটুকু খাবার আছে, এত মানুষের কুলোবে না।

উম্মে সুলাইমের (রা) মধ্যে কিন্তু চিন্তার লেশমাত্র নেই। তিনি স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এটুকু খাদ্য এত লোকের কিভাবে হবে, সেটা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ভালো বুঝেন।'

যতটুকু খাবার ছিল তা মহানবী (সা)-এর কাছে পেশ করা হলো। সেটুকু খাদ্য এতটাই বরকত পূর্ণ হলো যে, মহানবী এবং উপস্থিত সাহাবীরা সবাই পেট পুরে খেলেন।

অগ্নিপূজক ইরানীদের সাথে যুদ্ধ।

যুদ্ধ চলছে সুস্তার রণাঙ্গনে।

আনাস ইবনে মালিক এবং তার ভাই বারা ইবনে মালিক পদাতিক বাহিনীর অফিসার।

বারা ইবনে মালিক ছিলেন দক্ষিণ বাহুর একজন অফিসার।

অনেক দিন ধরে চলছে সুস্তার দুর্গের অবরোধ। যুদ্ধের এক ফাঁকে আনাস ইবনে মালিক তার ভাই বারা ইবনে মালিকের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, বারা সুর করে কবিতা আবৃত্তি করছেন।

আনাস ইবনে মালিক বললেন, 'ভাই আমার, আল্লাহ্ আমাদের কুরআন শরীফ দান করেছেন। কুরআন কবিতা থেকে উত্তম। সুললিত কণ্ঠে তা তেলাওয়াত করুন।'

বারা ইবনে মালিক হাসলেন। বললেন, "আনাস, সম্ভবত তুমি ভয় পাচ্ছ যে, আমি বিছানাতেই মারা যাব। কিন্তু আল্লাহর কসম, এমন তরো হবে না। আমি মরলে ময়দানেই মরবো।"

সে দিনই বাধল ইরানীদের সাথে এক ঘোরতর যুদ্ধ।

মরণপণ এ লড়াইয়ে মুসলিম বাহিনী চূড়ান্ত আঘাত হানতে চাইল ইরানীদের উপর।

ইরানীদের দুর্ধর্ষ সেনাপতি হুরমুযানকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হলো বারা ইবনে মালিক। ইরান সেনাপতির অবস্থানে বিপর্যয় ঘটাতে পারলে বিজয় সুনিশ্চিত হবে।

ইরান সেনাপতির দুর্ভেদ্য ব্যূহে ঝাঁপিয়ে পড়ল বারা ইবনে মালিক। ব্যূহটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বারা আক্রমণ করে বসলেন সেনাপতি হুরমুযানকে।

আহত, ক্লান্ত বারা শহীদ হলেন হুরমুযানের হাতে, কিন্তু ইরান বাহিনীর মেরুদণ্ড তখন ভেঙ্গে পড়েছে। বারা শহীদ হলেন, কিন্তু হুরমুযান শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বন্দী হলেন।

বারা তাঁর ভাই আনাসকে দেয়া কথা রাখলেন শাহাদাতের অমৃত পেয়ালা পান করে।

উহুদ যুদ্ধে যারা প্রাণান্ত লড়াই করেছেন, হারিস (রা) বিন সিমমা, তাদের একজন।

যুদ্ধের চরম বিপর্যয় মুহূর্ত। হযরত হারিস (রা) যুদ্ধের এক পর্যায়ে মহানবী (সা)-কে অরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পেলেন।

ছুটলেন তাঁর কাছে।

যুদ্ধের তীব্রতা একটু কমলে মহানবী (সা) হযরত হারিস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আবদুর রহমান বিন আওফকে দেখেছ?

হারিস উদ্বেগের সাথে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, পাহাড়ের দিকে কাফিরদের এক ঘেরাও-এর মধ্যে তাকে আমি দেখেছি। আমি তাঁর সাহায্যের জন্যেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনার দিকে নজর পড়তেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

রাসূল (সা) হারিস (রা)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আবদুর রহমানকে ফেরেশতারা রক্ষা করছেন।"

কিছুক্ষণ পর হারিস (রা) ছুটলেন আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের দিকে। তাঁর কাছে পৌছে দেখলেন, মুশরিকদের ৭টি লাশ তাঁর চারদিকে পড়ে আছে। তিনি আবদুর রহমান (রা) বিন আওফকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এদের সকলকেই কি আপনি হত্যা করেছেন?"

আবদুর রহমান (রা) জবাব দিলেন, "আমি আরতাত এবং অমুককে খতম করেছি। অবশিষ্ট ৫ জন মুশরিকের হত্যাকারী আমার নজরে পড়েনি।"

শুনে হারিস (রা) স্বাগত কণ্ঠে বললেন, "আল্লাহর রাসূল (সা) এ কথাই বলেছিলেন।"

অষ্টম হিজরী সাল।

সাইফুল বাহার যুদ্ধে যোগদান করেছে মুসলমানদের একটি ছোট্ট বাহিনী।

এই তিনশ' সদস্যের বাহিনীর মধ্যে আবু বকর (রা) ও উমর (রা) ছিলেন। আর ছিলেন মদীনার খাজরাজ সর্দার সা'আদ বিন উবাদাহর ছেলে কায়েস (রা)।

এই মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন আবু উবায়দাহ ইবনুল যাররাহ (রা)।

অভিযানকালে মুসলিম বাহিনীর রসদ ফুরিয়ে গেলে ভয়ানক সংকটে পড়ল তারা।

এই অবস্থা দেখে কায়েস উট ধার করে এনে সবার জন্যে জবাই করতেন। এভাবে তিনি তিন দিনে ৯টি উট ধার করে জবাই করার পর আবু বকর ও উমর চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং অধিনায়ক আবু উবায়দাহ ইবনুল যাররাহকে গিয়ে বললেন, 'কায়েস এভাবে যদি প্রতিদিন উট ধার করে এনে জবাই করতে থাকে, তাহলে তার পিতার সব সম্পদ সে এখানেই শেষ করে দেবে। আপনি তাকে উট জবাই থেকে বারণ করুন।'

আবু উবায়দা (রা) কায়েসকে সে মুতাবিক নির্দেশ দিলেন।

যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরার পর কায়েস (রা) পিতার কাছে মুসলিম বাহিনীর রসদ সংকট ও দুঃখ-দুর্দশার কথা জানালেন।

পিতা তাকে বলল, তুমি উট যোগাড় করে সকলের জন্যে জবাই করতে পারতে। কায়েস (রা) বললেন, পর পর তিন দিন আমি তাই করেছি। কিন্তু আবু বকর (রা) ও উমর (রা) এই কথা বলায় অধিনায়ক আবু উবায়দা (রা) আমাকে উট জবাই করতে বারণ করেন।

ক্ষোভ ও আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লেন সা'আদ (রা) ইবনে উবাদাহ। তিনি ছুটলেন মহানবীর কাছে।

মহানবী (সা) তখন বসেছিলেন। সা'আদ (রা) তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ালেন এবং অভিমান-ক্ষুব্ধ ও আবেগ-জড়িত কণ্ঠে মহানবী (সা)-কে বললেন, "ইবনে আবু কুহাফাহ এবং ইবনে খাত্তাব-এর পক্ষ থেকে কেউ জবাব দিক যে, তারা আমার পুত্রকে কেন বখিল বানাতে চায়?"

মাগের ইবনে মালিক (রা) মহানবী (সা)-এর একজন সাহাবী। সতর্কতা সত্ত্বেও কখনও কারো পা পিছলাতে পারে। মাগের ইবনে মালিকও (রা) গুরুতর অপরাধ করে বসলেন।

অপরাধ করার পরই আল্লাহর ভয় তার মধ্যে এক মহাযন্ত্রণার সৃষ্টি করল। তার মনে হলো, এ অপরাধের জন্য আল্লাহ-নির্ধারিত শাস্তি গ্রহণের মাধ্যমেই তার যন্ত্রণার অবসান হতে পারে।

মাগের ইবনে মালিক (রা) মহানবী (সা)-এর কাছে হাজির হলেন। বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাকে পবিত্র করুন।'

আল্লাহর রাসূল (সা) তাকে বললেন, "তোমার সুমতি হোক। যাও, গিয়ে আল্লাহর কাছে তওবা কর।"

মাগের ইবনে মালিক আল্লাহর রাসূলের এ আদেশ নিয়ে ফিরে চললেন। কিন্তু হৃদয়ের সে যন্ত্রণা তাঁর দূর হলো না। আল্লাহ-নির্ধারিত শাস্তি গ্রহণ করার মাধ্যমে তওবা না করলে কিভাবে তিনি পবিত্র হবেন? মনের তাড়নায় আবার তিনি ফিরে গেলেন মহানবীর কাছে। আগের মতই তিনি মহানবীর কাছে আরজ পেশ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে পবিত্র করুন?"

মহানবী (সা) আগের মতই তাঁকে নির্দেশ দিলেন।

মাগের ইবনে মালিক (রা) মহানবীর নির্দেশ নিয়ে আবার ফিরে গেলেন। কিন্তু মনের তাড়নায় আবার ফিরে এলেন। এভাবে তিনবার এই ঘটনা ঘটল।

চতুর্থবার মাগের ইবনে মালিক (রা) ফিরে এলে মহানবী (সা) মাগের ইবনে মালিক (রা)-কে বললেন, "আমি তোমাকে কি থেকে পবিত্র করব?"

মাগের বিনীতভাবে আরজ করলেন, 'ব্যভিচার থেকে।'

মহানবী (সা) আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এ মাতাল নাতো?"

সকলে বলল, 'সে মাতাল নয় ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

আল্লাহর রাসূল আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কি মদ খেয়েছে?'

লোকজন মাগের ইবনে মালিকের কাছে গিয়ে তার মুখ শুঁকে বলল, "না সে মদ খায়নি।"

এবার মহানবী (সা) মাগের ইবনে মালিককে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি সত্যই ব্যভিচার করেছ?'

মাগের আরজ করল, 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।'

মাগেরের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পুনরায় লাভ করার পর মহানবী (সা) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। প্রস্তরাঘাতে তাঁকে হত্যা করার শাস্তি কার্যকর করা হলো। ব্যভিচারের অপরাধ থেকে পবিত্র হবার জন্যে মাগের ইবনে মালিক পরম সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্তরাঘাতে তাঁর জীবন বিসর্জন দিলেন।

দু'তিন দিন পর মহানবী (সা) সাহাবীদের ডেকে বললেন, "তোমরা মাগের ইবনে মালিকের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া কর। সে যে তাওবা করেছে, তা গোটা একটা জাতির মধ্যে বন্টন করে দিলেও তাদের সকলের জন্যে তা যথেষ্ট হবে।"

উমর (রা) নিজের অহংকারকে শাস্তি দিলেন

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন আমীরুল মুমিনীন, অর্ধ পৃথিবীর শাসক।

ইনসাফের ব্যাপারে আপোষহীন উমারের (রা) শাসনদণ্ডকে ভয় না করেন এমন মানুষ নেই।

একদিন দেখা গেল সেই উমর ইবনুল খাত্তাব ভারি একটি পানির মশক ঘাড়ে নিয়ে হাঁটছেন।

বিস্মিত, বিক্ষুব্ধ তাঁর পুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন আপনি এরূপ করছেন?"

উমর (রা) বললেন, "আমার মন অহংকার ও আত্মগরিমায় লিপ্ত হয়েছিল, তাই ওকে আমি শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

উমর (রা) ন্যায়দণ্ডের রক্ষায় মানুষের ব্যাপারে যেমন কঠোর ছিলেন, তেমনি কঠোর ছিলেন নিজের ব্যাপারেও।

আলী (রা) তখন বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক।

আলী (রা) জ্ঞানের দরজা।

ন্যায়দণ্ডের এক আপোষহীন রক্ষক তিনি।

মদীনার এক শীতের রাত।

শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন আমীরুল মুমিনীন, বিশাল এক সাম্রাজ্যের শাসক আলী (রা)। শীত নিবারণের উপযুক্ত কাপড় তাঁর নেই।

অথচ তাঁর রাষ্ট্রীয় খাজাঞ্চীখানায় প্রচুর শীতবস্ত্র। বরং সে খাজাঞ্চীখানা তাঁরই হাতের মুঠোয় ।

কিন্তু তা থেকে একটি কম্বল নেবার জন্যে তাঁর হাত সেদিকে প্রসারিত হতে পারছে না। কারণ খাজাঞ্চীখানা জনগণের। তিনি তো রক্ষক মাত্র। সবার সাথে তাঁর নামে যেটুকু বরাদ্দ হবে, তাই শুধু তাঁর। অপেক্ষা করতে হবে তাকে সেই বরাদ্দের।

তাঁর আপোষহীন ন্যায়দণ্ড সদা উত্থিত ছিল। মানুষের জন্যে শুধু নয়, তাঁর নিজের জন্যও। আপনি আচরি ধর্ম তিনি অপরে শিখিয়েছেন।

ইমাম ইউনুসের ব্যবসায়

ইমাম ইউনুস বিন ওবায়েদের কথা। তিনি ইসলামের একজন বড় খাদেম। এই সাথে সাথে বড় ব্যবসায়ীও। বিরাট তাঁর কাপড়ের ব্যবসা। বিভিন্ন দামের কাপড় থরে থরে সজ্জিত তাঁর দোকানে।

তাঁর দোকানে এক ধরনের প্রতি জোড়া কাপড়ের দাম ছিল ৪০০ দিরহাম। অন্য আর এক ধরনের কাপড়ের প্রতি জোড়ার দাম ছিল ২০০ দিরহাম।

একদিন তিনি ভাতিজাকে দোকানে রেখে আসরের নামায পড়তে গেলেন। এ সময় একজন খদ্দের তাঁর দোকানে গেল এবং ৪০০ দিরহাম দামের একজোড়া কাপড় চাইল।

ইমাম ইউনুসের ভাতিজা তাকে ২শ' দিরহাম দামের এক জোড়া দিল।

খদ্দের কাপড় জোড়া দেখে পছন্দ করল এবং ৪০০ দিরহাম দিয়ে কাপড়টি নিয়ে নিল।

যখন খদ্দেরটি কাপড় নিয়ে চলে যাচ্ছিল, তখন ইমাম ইউনুস নামায পড়ে ফিরছিলেন। লোকটির হাতে কাপড় জোড়া দেখে চিনতে পারলেন যে, তাঁর দোকানের কাপড়। তিনি খদ্দেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কাপড়টি কত টাকা দিয়ে কিনেছে?

লোকটি বলল, ৪০০ দিরহাম। ইমাম বললেন, 'এটা তো দু'শ' দিরহামের কাপড়। যান কাপড় ফেরত দিয়ে আসুন।'

লোকটি বলল, আমি কাপড় পছন্দ করেই ঐ দাম দিয়ে কিনেছি। আমার এলাকায় এ কাপড়ের দাম ৫০০ দিরহাম। সুতরাং আমি ঠকিনি।

ইমাম বললেন, 'না কাপড় আপনাকে ফেরত দিতেই হবে। কারণ, ইসলামে মানুষের ব্যাপারে হিত কামনার চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না।'

ইমাম তাঁর ভাতিজাকে দারুণ ভর্ৎসনা করলেন, বললেন, 'তোমার মনে আল্লাহর ভয় হলো না?' ভাতিজা দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'খদ্দের মহোদয় কাপড় দেখে শুনে পছন্দ করে ঐ দামে কিনেছিলেন।'

ইমাম ইউনুস বললেন, নিজের জন্য যা পছন্দ কর, তা অপরের জন্যও পছন্দ করতে হয়, এ কথা ভুললে কেন?

বিলাল (রা)-এর ভাই আবু রুয়াইহা আশিয়ানী।

ইয়ামেনি এক পরিবারে তিনি বিয়ে করার ইচ্ছা করলেন।

তিনি ধরলেন তাঁর ভাই বিলালকে (রা) তাঁর বিয়ের পয়গাম পৌঁছাবার জন্যে।

ভাইয়ের অনুরোধে রাজী হলেন বিলাল (রা)।

তিনি ভাইয়ের বিয়ের পয়গাম নিয়ে গেলেন সেই ইয়ামেনি পরিবারে। তিনি গিয়ে বললেন, আমি বিলাল বিন রাবাহ, আবু রুয়াইয়া আমার ভাই। তাঁর ধর্ম ও চরিত্র দুইই খারাপ। আপনাদের ইচ্ছা হয় তাঁর সাথে আত্মীয়তা করুন, না হয় করবেন না।

বিলাল (রা) ভাইয়ের পয়গাম নিয়ে গিয়েও ভাইয়ের দোষ গোপন করলেন না। অথচ কথাবার্তার মাধ্যম বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এই দোষগুলো প্রকাশ করা তাঁর জন্যে স্বাভাবিক ছিল না।

বিলাল (রা)-এর এই স্পষ্টবাদিতা ও সততায় মুগ্ধ হলো কনে পক্ষ। তারা বলল, এ রকম একজন সত্যবাদী লোক তাদের মেয়ের বিয়ের পয়গাম এনেছে, এটা তাদের সৌভাগ্য, গৌরবের বিষয়। তারা বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল।

আবু বকর উমরকে চাইলেন উসামার কাছে

মুসলিম বাহিনী যাত্রা করেছে মু'তা অভিযানে।

বাহিনীর সেনাপতি উসামা বিন যায়েদ।

উসামা ঘোড়ায় সওয়ার।

বাহিনীকে বিদায় দেয়ার জন্য খলিফা আবু বকর উসামার ঘোড়ার পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন।

অস্বস্তিবোধ করছেন উসামা। মহামান্য খলিফাতুর রাসূল (সা) হাঁটবেন আর উসামা তাঁরই সামনে ঘোড়ায় বসে থাকবে।

উসামা খলিফা আবু বকর (রা)-কে বললেন, হে খলিফাতুর রাসূল, আপনি সাওয়ারিতে উঠুন, নয়তো আমি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ব।

সংগে সংগে আবু বকর (রা) বললেন, 'আল্লাহর কসম, তুমি নিচে নেমনা।' এই কথা আবু বকর (রা) তিন বার উচ্চারণ করলেন।

অথচ এই উসামা আযাদ করা দাস যায়েদের সন্তান।

উসামার এই বাহিনীতে উমর ছিলেন এক সাধারণ সৈনিক।

উসামার বাহিনীর সাথে উমরও যাচ্ছেন মু'তা অভিযানে।

শেষ মুহূর্তে খলিফা আবু বকরের মনে পড়ল, উমরের মদীনা থেকে অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। তাঁকে খলিফার দরকার হবে। কিন্তু তিনি তো উমর (রা)-কে মদীনায় থাকার নির্দেশ দিতে পারেন না। সেনাপতি উসামা তাঁর একজন সৈনিককে নিয়ে যাবেন না রেখে যাবেন, সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ উসামার।

খলিফা আবু বকর উসামাকে নির্দেশ নয় অনুরোধ করলেন, 'যদি আপনি ভাল মনে করেন, তবে অনুগ্রহপূর্বক উমরকে আমার সাহায্যের জন্যে রেখে যান।'

ইসলামের এই সাম্য ও গণতন্ত্রের কোন তুলনা নেই পৃথিবীতে।

উমর (রা) মনিব ও চাকরকে একসাথে খাওয়ালেন

মক্কা শরীফের একটি ঘটনা।

উমর (রা) তখন মক্কায়।

তিনি পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ গেল পাশেরই এক বাড়ীতে। বাড়ীর মালিকরা বসে খাচ্ছে আর চাকর-বাকররা পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রুদ্ধ হলেন উমর (রা)। তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং গিয়ে উঠলেন সেই বাড়ীতে। বললেন, "ব্যাপার কি! নিজেদের চাকর-বাকরদের সাথে এই বৈষম্যমূলক ব্যবহার করছ কেন?" বাড়ীর মালিকরা লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

চাকর-বাকরদের সাথে এই ব্যবহার জাহেলিয়াত যুগে চলে আসা বহু বছরের অভ্যাস। এই অভ্যেস এখনও নির্মূল হয়নি!

উমর (রা) চাকর-বাকরদেরকে ডেকে মনিবদের সাথে খানায় বসিয়ে দিলেন।

তারপর আবার ফিরে চললেন আপন গন্তব্যে।

উমর (রা) লোকদের সামনে সা'দকে দোররা কষলেন

মদীনা শরীফ।

ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী। খলিফা উমর (রা) লোকদের মধ্যে বায়তুল মালের কিছু অর্থ বণ্টন করছেন।

স্বাভাবিকভাবেই বিরাট ভিড় জমে গেছে।

এ সময় সেখানে এলেন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস। তিনি প্রভাবশালী ও অভিজাত মায়ের সন্তান।

ভিড় দেখার পর অন্যান্যদের মত তাঁর ধৈর্য ধরার দরকার ছিল, কিন্তু তা তিনি করলেন না।

তিনি ভিড় ঠেলে, দু'হাত দিয়ে লোকদের সামনে থেকে সরিয়ে উমরের কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

উমর (রা) ব্যাপারটা আগেই লক্ষ্য করেছিলেন।

সুতরাং সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস তাঁর সামনে হাজির হতেই উমর (রা) তাঁর হাতের দোররা কষলেন তাঁর পিঠে। উপস্থিত সবাই দেখল খলিফা একটা দোররা মেরেছেন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে।

দোররা মারার পর হযরত উমর (রা) সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে লক্ষ্য করে বললেন, "সবার এবং সবকিছুর উপরে যে আল্লাহর আইন, তা তোমার মনে নেই। আল্লাহর আইনের মুকাবিলায় তোমার কানাকড়িও যে মূল্য নেই, এটা তোমাকে বুঝিয়ে দেয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।"

ইবনে আবজা যে কারণে গভর্নর হলেন

উমর (রা)-এর খিলাফত-কাল। মক্কায় গভর্নর নিযুক্ত করেছেন তিনি নাফে ইবনুল হারিসকে।

কোন এক প্রয়োজনে খলিফা উমর (রা) এসেছিলেন আরবেরই 'উসফান' নামক স্থানে। খলিফা সেখানে মক্কার গভর্নর নাফেকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

নাফের সাথে যখন উসফানে উমর (রা)-এর সাক্ষাৎ হলো, তখন তিনি নাফেকে (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'মক্কায় তুমি কাকে তোমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছ?'

নাফে বললেন, 'আজাদকৃত গোলাম ইবনে আবজাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছি।'

উমর (রা) ইবনে আবজাকে পুরোপুরি জানতেন না। বললেন, "সেকি! একজন আজাদকৃত গোলামকে মক্কাবাসীদের উপর নিজের স্থলাভিষিক্ত করে দিয়ে এলে"?

নাফে বলল, "তিনি কুরআনে অভিজ্ঞ, শরীয়তে সুপণ্ডিত এবং সুবিচারক।"

উমর (রা) স্বগতোক্তির মত বললেন, "হবেই তো! রাসূল (সা) বলে গেছেন, আল্লাহ তায়ালা এই কিতাব দ্বারা অনেককে ওপরে তুলবেন, অনেককে নীচে নামাবেন।"

খলিফা আল-মানসুর যখন লা-জবাব

মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী তখন বাগদাদে।

খলিফা আল-মানসুরের শাসনকাল। খলিফার পরিচিতি নিয়ে চললেও এই শাসন তখন বহু ক্ষেত্রেই খেয়াল খুশীর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন জনগণের বাইতুল মাল তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত ব্যবহার করতেন।

কিন্তু অবিরাম প্রতিবাদ হয়েছে এই স্বেচ্ছাচারিতার।

এক দিনের একটি ঘটনা।

সুফিয়ান সওরী গেলেন খলিফা আল-মানসুরের দরবারে। তিনি বললেন তাঁকে, "আমীরুল মুমিনীন, আপনি আল্লাহ ও মুসলমানদের ধন-সম্পদ তাদের ইচ্ছা ও সম্মতি ছাড়াই ব্যয় করছেন। বলুন এর কি জবাব আছে আপনার কাছে?"

বলে একটু থেমেই খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবার বলতে শুরু করলেন, "উমর (রা) একবার সরকারী খরচে হজ্ব করেছিলেন। তাতে তাঁর ও তাঁর সংগী-সাথীদের উপর সর্বমোট ১৬ দিনার ব্যয়িত হয়েছিল। তথাপি হযরত উমর (রা) বলেছিলেন, 'আমরা বাইতুল মালের উপর বিরাট বোঝা চাপিয়েছি।' আপনি নিশ্চয় জানেন, মনসুর ইবনে আম্মার আমাদেরকে কি হাদীস শুনিয়েছিলেন। কারণ সেই মজলিসে আপনিও হাজির ছিলেন এবং সর্বপ্রথম হাদীসটা আপনিই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সে হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পদে নিজের খেয়াল-খুশীমত হস্তক্ষেপ করবে তার জন্যে দোজখের আগুন অবধারিত।"

সুফিয়ান সওরীর এ স্পষ্ট বক্তব্যে খলিফার চাটুকাররা ক্ষেপে গেল। কয়েকজন ঝুনা চাটুকার বলে উঠলেন, 'কি, আমীরুল মুমিনীনের সাথে এ ধরনের আলাপ?'

সুফিয়ান সওরী তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ হতভাগা, হামান ও ফেরাউন এভাবেই চাটুকারিতা করে পরস্পরকে ধ্বংস করেছিল'– বলে যে উন্নত শির নিয়ে সুফিয়ান সওরী আল-মানসুরের দরবারে ঢুকেছিলেন, সেভাবে শির উন্নত রেখেই তিনি দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন।

প্রবল প্রতাপশালী খলিফা আল-মানসুর সুফিয়ান সওরীর কথার জবাবে একটি কথাও বলতে পারেননি।

আব্বাসীয় খলিফা হাদী'র শাসনকাল।

বাগদাদে প্রধান বিচারপতি আবু ইউসুফের আদালত।

এক ব্যক্তি একটি মামলা নিয়ে এলেন আদালতে। মামলা স্বয়ং খলিফা হাদী'র বিরুদ্ধে।

একটা বাগান নিয়ে খলিফার সাথে তাঁর ঝগড়া। লোকটির দাবী বাগানটি খলিফা হাদীর নয়, তাঁর।

সব শুনে বিচারপতি আবু ইউসুফ নিশ্চিত হলেন বাগানটি লোকটিরই প্রাপ্য। কিন্তু সমস্যা হলো খলিফার পক্ষে দু'জন সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই অবস্থায় বিচারপতি আবু ইউসুফ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য খলিফাকে আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দিলেন।

খলিফা আদালতে হাজির হলে বিচারপতি আবু ইউসুফ তাঁকে বললেন, 'খলিফার সাক্ষীরা যে সত্যবাদী এ ব্যাপারে খলিফাকে শপথ করতে হবে।'

খলিফা এই শপথ করার চাইতে বাগানটি বাদীকে ছেড়ে দেয়াকেই সহজ মনে করলেন এবং বাগানটি বাদীকে দিয়ে দিলেন।

আবু ইউসুফের আরেকটি বিচারের ঘটনা।

আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ তখন শাসন ক্ষমতায়। একটি মামলায় খলিফা আবু ইউসুফের আদালতে হাজির হলেন। খলিফার দাবীর পক্ষে সাক্ষী ছিল ফজল ইবনুর রাবী।

বিচারপতি আবু ইউসুফ ফজল ইবনুর রবীর সাক্ষ্য বাতিল করে দিলেন।

খলিফা হারুনুর রশীদ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "ফজলের সাক্ষ্য নাকচ করে দেবার কারণ কি?"

বিচারপতি আবু ইউসুফ বললেন, "আমি ফজলকে বলতে শুনেছি যে, সে আপনার গোলাম।" যদি তার কথা সত্য হয়, তাহলে আপনার গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, আর যদি সে আপনার গোলাম না হয় তাহলে সে মিথ্যুক। মিথ্যুকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে না।"

জাহির নামের এক সুলতান তখন দামেশ্‌কের সিংহাসনে।
বৃষ্টি না হওয়ায় পশুর মড়ক ইত্যাদি কারণে সিরিয়ায় তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা। মানুষের দুর্গতির সীমা নেই।
এই সময় যুদ্ধ-প্রস্তুতির কথা বলে শাসক জাহির জনগণের উপর ট্যাক্স বসালেন।
দামেশ্‌কেই বাস করতেন শেখ মহিউদ্দিন নববী নামের এক বিখ্যাত আলেম। তিনি সুলতান জাহিরের কাছে এক চিঠি লিখে দুর্গত জনগণের উপর ট্যাক্স না বসাবার জন্যে অনুরোধ করলেন।
শেখ মহিউদ্দিনের এই চিঠি পেয়ে সুলতান ক্ষুব্ধ হলেন এবং তার ট্যাক্স বসাবার পক্ষে আলেমদের ফতোয়া জোগাড় করতে লাগলেন।
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাধ্যমে এ ধরনের বহুসংখ্যক ফতোয়া জোগাড় হবার পর জাহির ডাকলেন শেখ মহিউদ্দিনকে তাঁর দরবারে।
শেখ দরবারে এলে সুলতান তাঁকে ফতোয়ায় অন্য আলেমদের দস্তখত দেখিয়ে ট্যাক্স বৃদ্ধির পক্ষে তাঁকেও দস্তখত দিতে বললেন।
সুলতান জাহির-এর এই কৌশল ও তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ দেখে শেখ মহিউদ্দিন নববী খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি সুলতানকে বললেন, 'আমি জানি, আপনি একজন কয়েদী ক্রীতদাস ছিলেন। ছিলেন একজন দেউলিয়া। আল্লাহ আপনার উপর অনুগ্রহ করেন এবং আপনাকে বাদশাহর মর্যাদায় উন্নীত করেন। আমি জানি, আপনার কাছে জরিদার কাপড় পরিহিত এক হাজার ক্রীতদাস এবং আপাদমস্তক স্বর্ণালংকারে মণ্ডিত একশো ক্রীতদাসী রয়েছে। এখন আপনি যদি ক্রীতদাসদের এই জরিদার কাপড়গুলো এবং দাসীদের অলংকারসমূহ বিক্রি করে দেন, তাহলে আমি ফতোয়া দেব যে, প্রজাদের নিকট থেকে আপনার ট্যাক্স আদায় বৈধ।"
সুলতান জাহির ক্রোধে ফেটে পড়লেন শেখ মহিউদ্দিনের এই কথায়। তৎক্ষণাত তাঁকে বহিষ্কার করলেন দামেশ্‌ক থেকে।
দেশের সমস্ত আলেম ও ফকিহগণ আহত হলেন এই ঘটনায়। তাঁরা সকলে সুলতান জাহিরকে বললেন, "ইনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ও সবার সেরা আলেম। তাঁকে দামেশ্‌কে ফিরিয়ে আনুন।"
বাদশাহ জাহির অনুমতি দিলেন শেখ মহিউদ্দিনকে দামেশ্‌কে আসার জন্যে।
কিন্তু শেখ মহিউদ্দিন সুলতানের এই অনুগ্রহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন, 'যতদিন জাহির সেখানে থাকবেন, আমি যাব না।'
এই ঘটনার এক মাসের মধ্যে জাহির ইন্তিকাল করলেন।

'এ দরবারে শুধু একজন আলেমই আছেন'

সুলতান আবদুল আজিজ মিসর সফরে আসছেন। সাড়া পড়ে গেছে গোটা মিসরে। মিসরের শাসক ইসমাঈল সম্বর্ধনার আয়োজনে মহাব্যস্ত। সুলতান খুশী হলে শুধু তার আসন পাকাপোক্ত হওয়াই নয়, বহু আকাঙ্ক্ষিত খেতাবও এবার মিলে যেতে পারে।

সুলতানের জন্যে আড়ম্বরপূর্ণ সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করলেন।

নির্দিষ্ট দিনে সুলতান আবদুল আজিজ মিসরে আসলেন। তাঁর সম্মানে বিশেষ দরবার বসানো হলো।

সুলতানকে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে আলেমদেরও একত্রিত করা হয়েছে।

আলেমদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাঁরা অবনত মস্তকে দরবারে সুলতানের সামনে হাজির হবেন এবং মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করার পর পিছু হটে দরবার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, সুলতানকে পেছন দেখিয়ে অসম্মান করা যাবে না কিছুতেই। সুলতান খুশী হলে আলেমরা প্রচুর ইনাম পাবেন।

একে একে আলেমরা দরবারে প্রবেশ করতে লাগলেন অবনত মস্তকে এবং কুর্নিশ করে পিছু হটে বেরিয়ে এলেন।

আলেমদের মধ্যে ছিলেন শেখ হাসানুল আদাদী।

সর্বশেষে এল তাঁর দরবারে প্রবেশের পালা।

তিনি উন্নত শিরে দরবারে প্রবেশ করলেন। সুলতানকে কুর্নিশ না করে তিনি সালাম দিলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে যেভাবে দরবারে প্রবেশ করেছিলেন, সেইভাবে উন্নত শিরে দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন।

সুলতানের কাছে বসা ইসমাঈলের মন হায় হায় করে উঠল। সুলতান নিশ্চয় অপমানিত বোধ করেছেন এবং ভীষণ ক্ষুব্ধ হবেন নিশ্চয়।

দরবার শুদ্ধ সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। মহামান্য সুলতান কি করেন সেই শংকা দেখা দিল সকলের মনে।

দরবার থেকে বের হলে সকলেই শেখ হাসানুলকে ছেঁকে ধরলো।

বলল তাঁকে, আপনি একি করলেন সবকিছু জানার পরেও।

শেখ বললেন, একজন সুলতান হিসেবে যে সম্মান পাওয়া উচিত তাঁকে তা দিয়েছি।

দরবার শেষ করার আগে সুলতান আবদুল আজিজ আলেমদের মধ্যে শুধু শেখ হাসানুল আদাদীকেই পুরস্কৃত করলেন এবং বললেন, 'এই দরবারে শুধু এই একজন আলেমই রয়েছেন।'

উমর (রা) জমির মালিক হওয়ার পর

মদীনায় হিজরতের পর উমর (রা) দরিদ্রের জীবন যাপন করতেন।

খাইবার যুদ্ধের পর তাঁর ভাগে পড়লো উৎকৃষ্ট এক খণ্ড জমি, যা উমরের জন্যে নিয়ে এলো সচ্ছল জীবনের এক সম্ভাবনা।

জমির মালিকানা পাওয়ার পর উমর (রা) মহানবী (সা)-এর কাছে হাজির হলেন। বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, খাইবারে আমি খানিকটা জমি পেয়েছি। এত মূল্যবান সম্পত্তি আমি কোনদিন পাইনি। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?'

আল্লাহর রাসূল (সা) উমরের মনোভাব বুঝলেন। তাঁকে বললেন, "যদি তোমার মন চায়, তাহলে আসল জমি নিজের অধিকারে রেখে জমির ফসল দান করে দাও।"

তাই করলেন উমর (রা)। গরীব-দুঃখী ও অভাবী আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য, গোলামদের আজাদ করা ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যে তিনি তার প্রাপ্ত গোটা সম্পত্তি ওয়াকফ করে দিলেন।

দারিদ্র সচ্ছলতার প্রতি কোনো লোভ উমরের (রা) মধ্যে সৃষ্টি করতে পারেনি।

হুসাইন ঝর্ণা বিক্রি করলেন

মহানবীর (সা) প্রিয় নাতি হুসাইন (রা)।

তিনি ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী (রা)-এর পুত্র।

দরিদ্রের জীবন তাঁর।

বিরাট ঋণের বোঝা তাঁর মাথায়।

কিন্তু 'আবী নাইজার' নামক অতি মূল্যবান ঝর্ণার মালিক তিনি।

অনেকেই হুসাইনকে (রা) পরামর্শ দেন যে, 'আবী নাইজার' ঝর্ণা বিক্রি করে ঋণ শেষার্ধ করেও বেশ অর্থের মালিক হতে পারেন তিনি।

কিন্তু আবী নাইজার ঝর্ণার পানি গরীব মুসলমানরা ব্যবহার করে। এ ঝর্ণার পানি থেকে সেচ করে তারা ফসল ফলায়। হুসাইন (রা) এ ঝর্ণা বিক্রি করলে গরীব মুসলমানরা এ ঝর্ণার পানি থেকে বঞ্চিত হবে। হুসাইন লাভবান হলেও মহাক্ষতিগ্রস্ত হবে বিরাট সংখ্যক গরীব মুসলমান।

এই চিন্তা করে হযরত হুসাইন (রা) আবী নাইজার ঝর্ণা বিক্রি করতে রাজী হননি। গরীব মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করার পরিবর্তে নিজের দারিদ্র ও ঋণের বোঝা বহনকেই বেহ্তর মনে করেন তিনি।

www.icsbook.info

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN : 984-31-0932-5 Set